শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-বারো

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
কানাই পাল

তিন টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমিথিলাকান্ত চক্রবর্তী

শ্রীচরণকমলেষু

তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। 'আয় চাঁদ' একটি কাহিনী মাত্র।

১২০, অফিসার্স কলোনি,
কাঁচরাপাড়া।

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

রূপম্ ?

একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

অগ্নি অবগুণ্ঠনে

জনম জনম

তুঙ্গভদ্রা

কী মায়া

আরও আলো (যন্ত্রস্থ)

রমাণি বীক্ষ্য :

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব

২. দ্রাবিড় পর্ব

৩. কালিন্দী পর্ব

৪. রাজস্থান পর্ব

৫. সৌরাষ্ট্র পর্ব

এক

নিচের পৃথিবীতে অন্ধকার হয়তো অনেকক্ষণ নামেনি। কিন্তু পাহাড়ের এই সংকীর্ণ উপত্যকায় কালির মতো ঘন হয়েছে সায়াহ্নের অন্ধকার। আকাশে আজ চাঁদ ওঠেনি। ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে এখনও একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের ছায়ায় পৃথিবীটা যেন আরও ছোট হয়ে গেছে। রাম সিং বাহিরে পেট্রম্যাক্স জ্বালবে, তার আগে আমাদের লণ্ঠন দিয়ে গেল। তাঁবুর ভিতর ড্রইং টেবিলে বসে আমরা নক্সা সম্পূর্ণ করব।

নিকটের নদী থেকে জলস্রোতের শব্দ আসছে অল্প অল্প। ঝিঁঝি ডাকছে অবিশ্রাম। বাতাসে ঝাউ গাছের চামর দুলছে। খসখস করে শব্দ হচ্ছে চীর গাছের ঝরা পাতার। অন্ধকারে এই বনময় পৃথিবী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, সবাই তার জন্য সতর্ক হয়ে আছে।

হঠাৎ আমার আলসেসিয়ান কুকুরটা ডেকে উঠল। একবার দুবার নয়, বার বার ডাকতে লাগল। কোন শত্রুর সন্ধান পেয়েছে, এমনি দুরন্ত আক্রোশে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাকতে লাগল। টর্চটা হাতে করে আমি বাহিরে বেরব ভাবছি, এমন সময় সহসা থেমে গেল। মনে হল, চারিদিক একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছে। একেবারে নিঃসাড় প্রাণহীন পৃথিবী। ছুটে আমি বাহিরে বেরিয়ে এলুম।

ভূতো নেতিয়ে পড়েছে। বিস্ফারিত চোখে যেদিকে চেয়ে আছে, আমি সেদিকে কিছু দেখতে পেলুম না। একটা দমকা বাতাস বুঝি ঘূর্ণীর মতো পাক খেয়ে গেছে সামনে দিয়ে। অন্ধকারে তার ছায়া পড়েনি, শুধু শুকনো পাতার উপর মর্মরধ্বনি উঠল যক্ষের নিঃশ্বাসের মতো।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সারা শরীরে আমার কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আমি কিছু দেখতে পাইনি। কিন্তু মনে হল, অনেক দেখার চেয়ে বেশি আমি দেখেছি। কল্পনার অতীত কোন অবিশ্বাস্য বস্তু।

পিছন থেকে হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল। চমকে ফিরে দেখলুম আমার সহকর্মী গোবিন্দকে। অত্যন্ত সহজভাবে প্রশ্ন করল : কিসের গোলমাল ?

গোলমালের কথা বলতে আমি সাহস পেলুম না। গোবিন্দর দৃষ্টি ঠিক বৈজ্ঞানিকের মতো নয়। অলৌকিক কথায় বিশ্বাস করে সে কী কাণ্ড করবে, তার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বললুম : কিছু নয়।

গোবিন্দ বোধহয় বিশ্বাস করল না। বলল : ভূতো অমন পাগলা হয়েছিল কেন ?

নাম শুনেই ভূতো এগিয়ে এল। লম্বা জিব বার করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। এবারে লেজ নাড়তে লাগল খুব জোরে জোরে। বললুম : দেখছ তো, কিছু হয়নি বলছে।

হঠাৎ আমার রাম সিং-এর দিকে নজর পড়ল। পেট্রম্যাক্স বাতিটা হাতে নিয়ে অন্ধকারে সে বসে আছে। চেঁচিয়ে বললুম : কী ব্যাপার রাম সিং ?

লোকটা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে বলল : কিছু নয়।

গোবিন্দ একবার কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল, আর একবার রাম সিং-এর দিকে। তারপর বিরক্তভাবে ভিতরে গিয়ে কাজে বসল।

দুই

আমরা নূতন পৃথিবী গড়ছি।

লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে যে ফসল ওঠে, তাতে আমাদের পেট ভরেনা। আমরা কলের লাঙল চালাচ্ছি। জলের জন্য আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকিনা। খাল কেটে জল আনছি প্রয়োজনমতো। বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করছি। নকল বৃষ্টিরও ব্যবস্থা করছি। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, পৃথিবীতে বেড়াবার জায়গা ভালো নেই, চাঁদে কিংবা মঙ্গলগ্রহে অবকাশ যাপন করা দরকার। অনেকে সেখানে জমি কিনছেন পাকাপাকি বসবাসের জন্য। জগৎটাই নূতন হবে।

পৃথিবীর সব দেশে আমরা উঠে-পড়ে লেগে গেছি। কেহ এগিয়ে গেছি, কেহ পিছনে পড়ে আছি। সবার চোখে তবু একই স্বপ্ন— আমরা নূতন পৃথিবী গড়ব।

কালী নদীর স্রোত ধরে আমরা ধীরে ধীরে উপরে উঠছি। তাঁবু ফেলেছি নদীর তীরেই। এই উপত্যকার অনেক জায়গাতেই এখন জরীপের কাজ হচ্ছে। কালীকেই প্রথমে বাঁধতে হবে। নেপাল আর পাঞ্জাবের সীমানা দিয়ে নামবার সময় মাঝে মাঝেই ক্ষেপে যায়। নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ঘর্ঘরাকে শাসন করতে হলে আগে কালীকে সামলাতে হবে। তারপর রেলের লাইন বসবে, খোলা হবে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-পথ। ভারতবর্ষ থেকে মানুষ মানস-সরোবরে স্নান করতে যাবে বিদ্যুতের ট্রেনে চেপে, ফিরবে কৈলাস দর্শন করে।

জনকয়েক চেনম্যান খালাসি নিয়ে আমরা দুজন সারভেয়ার আছি একসঙ্গে এই পার্বত্য অরণ্যের ভিতর। নিজেদের তাড়াতেই তাড়াতাড়ি

কাজ করি। সকাল-সকাল প্রাতরাশ সেরে গোবিন্দ গেছে উত্তর দিকে। আমি এলুম দক্ষিণে।

বন এখানে গভীর নয়। বেশ হালকা হয়ে গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে। সূর্য এখনও বনের আড়ালে ঢাকা আছে। আর একটু পরে রোদ আসবে। রোদের বন্যায় এই বন আর প্রান্তর ভেসে যাবে। শীতের জড়তা শুধু অল্পক্ষণের। আঙুল আড়ষ্ট থাকবে আর কিছুক্ষণ। তারপর কাজ করতে করতেই সব ভুলে যাব। সূর্য যখন মাথার উপরে আসবে, তখন আর মনে হবেনা যে পাহাড়ের উপর বনের ভিতর আমরা কাজ করছি। গায়ের গরম জামা তখন খুলে রাখতে ইচ্ছে হবে। গাছের ডালে টাঙানো টুপিটা আবার মাথায় তুলে নেব।

আরও একটা জিনিস সর্বত্র লক্ষ্য করেছি। নূতন কিছু দেখতে গ্রামের লোকের ভারি কৌতূহল। শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বড় বড় মেয়ে পুরুষরাও আসবে। এই বনের ধারে এতগুলো লোক কী করছে! ক্ষেত নেই, ফসল নেই, তবু কেন লোকগুলো এমন পরিশ্রম করছে! বনের ভিতর শিকল টানাটানি, আর দূরবীনের ভিতর দিয়ে ঘন ঘন গজ দেখা!

একটি ছোট মেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল ভয়ে ভয়েঃ ওর ভিতরে কী আছে?

তার উপযুক্ত প্রশ্নই বটে। সারাক্ষণই ওতে আমি চোখ দিয়ে আছি। বলছি 'ডাইনে' 'বাঁয়ে'। হিজিবিজি দাগ কাটছি কাগজের গায়ে। দেখবার জিনিস নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে। বললুমঃ দেখবে?

সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়ে। বয়স তার আট-দশ বছরের বেশি হবেনা। আমার প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠল। সুর করে বললঃ হাঁ।

মাথাটাও দোলাল সেই সঙ্গে।

বললুমঃ এস—

আমার আদেশের অপেক্ষা সে করেনি। সোজা আমার পাশে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তাকে তুলে ধরতে হবে। তুলে না ধরলে দূরবীনে তার চোখ পৌঁছবেনা। খালাসি সোহন এগিয়ে আসছিল। তার আগেই মেয়েটিকে আমি তুলে ধরলুম।

ভারি পুলক তার। নানা ভাবে দেখল, দুচোখ দিয়ে দেখল। কী দেখে ভাল লাগল সেই জানে। খুশিতে উপছে উঠল।

ততক্ষণে সব ছেলেমেয়ে এগিয়ে এসেছে। বড়রাও। সোহন সবাইকে তাড়াতে যাচ্ছিল। বললুম ঃ দেখুক সবাই।

আর যায় কোথা! এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল। দূরবীন উল্টে পড়বার যোগাড়। খালাসিরা একে একে সবাইকে তুলে দেখাল। বড়রাও দেখল।

সুন্দর মেয়েটি আমার সঙ্গে গল্প জুড়েছে। বলল ঃ দেখে কী হয়?

বললুম ঃ যারা দেখতে পায়না, তাদের দেখাই।

মেয়েটি ভাল বুঝতে পারেনি। তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

বললুম ঃ এসব জায়গা তোমরা রোজ দেখছ। দেশে এমন অনেক লোক আছে, যারা একদিনও দেখতে পাবেনা। অথচ তোমাদের ভালোর জন্যে অনেক কিছু করতে চায়। তারা কী করে দেখবে বল!

আমাদের ভাল করবে?

মেয়েটি আশ্চর্য হল।

নিশ্চয়ই করবে।

দিদির করবেনা?

হেসে বললুম ঃ তারও করবে।

কিন্তু কী করে করবে?

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমরা বুঝি সব জায়গা দেখবে?

বললুম : হাঁ।

ছোট হাতখানা তুলে শূন্যে নির্দেশ করল : ঐ দিকটাও ?

বললুম : ঐ দিকটাও।

যেখানে যেতে মানা আছে ?

বুঝলুম শ্মশানের কথা বলছে। বললুম : সেখানটাও।

মেয়েটির চোখ বড় বড় হল। বলল : ভয় করবেনা ?

হেসে বললুম : তুমি তো আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাহলে ভয় করবেনা।

মেয়েটির মুখ মলিন হল। ভয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

গম্ভীরভাবে বললুম : তুমি যদি যেতে না চাও, তাহলে অন্য কথা। জোর করে তোমাকে নিয়ে যাব না।

এই আশ্বাসটুকু পেয়ে আবার প্রশ্ন করল : কারণবাবার গুহাও দেখবে ?

বললুম : দেখব।

মাথা দুলিয়ে মেয়েটি বলল : তাহলে আর ফিরতে দেবেনা।

ছেলেমেয়েরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছিল। সোহন সবাইকে তাড়া দিচ্ছে। ঠেলেও দিচ্ছে দুএকজনকে। বড়দের কৌতূহল নিবৃত্তি হয়েছে। বলল : চল্ চল্, বাড়ি চল্।

বলে সবাইকে একরকম টেনেই নিয়ে গেল।

আমি জানতুম এই ছেলেমেয়েরা কালও আসবে। এলও তাই। আমরা পৌঁছবার আগেই কয়েকজন সেখানে জড়ো হয়ে আছে। সেই সুন্দর মেয়েটিও আছে। আমি কাছে আসতেই দল ছেড়ে এগিয়ে এল।

কাছে টেনে নিয়ে বললুম : কাল তোমার নাম বলনি তো ?

আমার নাম : মেয়েটি ভারি খুশী হল, বলল : পেমা।

ভারি সুন্দর নাম তো!

গদগদ ভাবে পেমা বলল : জান, কাল সন্ধ্যেবেলায় দিদি এসেছিল। তোমার কথা তাকে বলেছি।

কী বলেছ?

তুমি বলনি, দিদিরও ভাল করবে।

বলেছি তো।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমি এই মেয়েটির আনন্দের আড়ালে কোন বেদনার ইঙ্গিত পেলুম। তার কচি মনের কোথায় যেন অনেকখানি বেদনা জমে আছে। আমার আশ্বাসে প্রচুর আরাম পেয়েছে। তাই একটা গর্বের ভঙ্গিতে তাকাল তার সঙ্গীদের দিকে।

ছেলেমেয়েরা এক সময় বাড়ি গেল।

আবার ঘুরে এল দুপুরের দিকে। তখন আমি একটা গাছের নিচে বসে ফ্লাস্কে চা ঢেলে খাচ্ছি।

পেমাকে কাছে ডাকলুম।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে কাছে এল। এমন একটা ভঙ্গি করে তার সঙ্গীদের দিকে চাইল যে না হেসে থাকতে পারলুম না। তার গর্বের কারণ আমি বুঝি। এতগুলো ছেলেমেয়ের ভিতর তাকে আমি কাছে ডাকলুম, এতেই গর্ব। জিজ্ঞাসা করলুম : তোমার দিদি এলনা?

পেমার প্রসন্ন মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তার পিছনে আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসেছিল। তারই বয়সী। সে বলল : ওর দিদি তো কারণবাবার গুহায় থাকে।

কেন জানিনা, আমি চমকে উঠলুম।

পেমা বলল : কারণবাবা ধরে নিয়ে গেছে। কিছুতেই দিদিকে ছেড়ে দেয়না।

দিদি কি পালিয়ে আসতে পারেনা ?

কী করে আসবে বল ? কারণবাবা টের পেলে দিদিকে মেরে ফেলবে।

যে মেয়েটি এগিয়ে এসেছিল সে বলল : ওর দিদিই তো আসতে চায় না।

আপত্তি জানিয়ে বললুম : না না, তা কেন হবে ? ওর দিদি যে পেমাকে খুব ভালবাসে।

সেই মেয়েটি আমার কথা মেনে নিলনা। বলল : তুমি জাননা। আমার মা বলে যে কারণবাবা কি কাউকে জোর করে ধরে রাখতে পারে ?

পারেনা আবার : পেমা প্রতিবাদ করল : যেয়েই দেখনা একবার ! দিদি বলছিল, সে না গেলে তাকে কেটে ফেলবে। আর বাড়ির লোক যদি তাকে ধরে রাখে তো সবাইকে কেটে ফেলবে।

ঠোঁট উল্টে অন্য মেয়েটি বলল : কাটলেই হল আর কি !

আমি হেসে বললুম : তোমার তো সাহস খুব। চলনা, আজ তোমার সঙ্গে কারণবাবার আশ্রমে যাই।

ভয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে মেয়েটি পিছিয়ে গেল।

মজা দেখবার জন্য আমি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম। মেয়েটি পিছন ফিরেই লম্বা ছুট দিল।

তার পালিয়ে-যাওয়া দেখে অন্য কোন মেয়ে হাসলনা। হাসতে পারেনা। কারণবাবার নামে সবাই যে পালিয়ে যাবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। মেয়েটা যা বলেছে, এটা তার নিজের কথা নয়, ওর শোনা কথা। তার নিজের কথা ধরা পড়েছে তার পালিয়ে-যাওয়ায়।

পেমা বলল : ওর কথা তুমি বিশ্বাস ক'রোনা। ও কিছু জানেনা।

হেসে বললুম : সে আমি বুঝতে পেরেছি।

পেমা খুব নিশ্চিন্ত হল।

আমার চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। ফ্লাস্কটা বন্ধ করে আমি উঠে পড়লুম।

কাজ সেরে বাড়ি ফিরবার সময় মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। পেমার কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম তার দিদির কথা। বয়স নিশ্চয়ই বেশি হবেনা, কিন্তু পেমার মতো ছোট নয়। কারণবাবার আশ্রমে থাকে। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসে, আবার ফিরে যায়। গ্রামে এই নিয়ে যে আলোচনা হয় তা মুখরোচক। তারই খানিকটা আভাষ পেয়েছি আর একটি ছোট মেয়ের কথায়। সবটুকু সে বোঝেনা বলেই সব কথা সে বলতে পারেনি। যা বলেছে, তাতেই ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া চলে।

সোহনরা আমার অনেক পিছনে ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিল। এত সাবধানে বলছিল যে আমার কানে কিছুই আসছিল না। হঠাৎ একজন হেসে উঠল। কেন হাসল, তারাই জানে। কিন্তু আমি চমকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম।

তিন

ক্যাম্পে ফিরে দেখলুম, গোবিন্দ তখনও ফেরেনি। অথচ তার লোকজনরা সবাই ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সে আজ দেরিতে ফিরবে, আমরা যেন অনর্থক হয়রান হতে না বেরই। বললুম : কোথায় গেছে বলতে পার?

একজন বলল : বোধহয় কারণবাবার আশ্রমের দিকে।

কী করে বুঝলে?

গাঁয়ের ছেলেমেয়ে রোজই তো অনেক আসে। তাদের কাছে কারণবাবার গল্প জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁর আশ্রম কোথায়, কখন তাঁর দেখা পাওয়া যায়, এইসব কথা।

উত্তরে আমি শুধু 'হুঁ' বললুম। একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। দুদিন ধরে যে ভয় পাচ্ছিলুম, সেই ভয়ই তাহলে সত্য হল। গোবিন্দকে তো আমি চিনি। কারণবাবার কাছে একটুখানি প্রশ্রয় পেলেই তার পাগলামি আবার জেগে উঠবে। তারপর আর রক্ষে নেই। আজ একাদশী, কাল অমাবস্যা। কারণ পাত্র আদা নুন। নিত্যকর্ম মন্দের ভাল, শ্মশান-সাধনা শুরু হলেই প্রাণান্ত ব্যাপার। সারারাত নৃত্য করে দিনের বেলায় দূরবীন ভাঙবে। ওর খালাসিরা বলে, দূরবীনে চোখ রেখে নাকি একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওরা ধরে না ফেললে সেবারে দূরবীনটাই ভাঙত।

মুখ হাত ধুয়ে যখন খেতে বসলুম, গোবিন্দ তখনও ফেরেনি। সোহন এসে কাছে দাঁড়াল। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। খাবার সময় আমাকে সে একা থাকতে দেয়না। কেউ না থাকলে নিজে এসে দাঁড়ায়। অকারণে নানা গল্প করে। বোধহয় একদিন আমি

বলেছিলুম যে গল্প করে খেলে আমি বেশি খাই। এটা সত্য কথা। মা আমাকে বলতেন। খাবার সময় একদিন তিনি বাড়ি ছিলেন না। ফিরে এসে এঁটো থালা দেখে কথাটা বলেছিলেন, একা খেলে নাকি আমার পেট ভরে না। কথাটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। বিদেশে এসে মার কথা কার না মনে পড়ে!

কিন্তু সোহনকে কাছে দাঁড়াতে দেখলে আমার হাসি পায়। লম্বা-চওড়া বিরাট চেহারা, লোহার মতো মজবুত চকচকে। গোঁফ বড় বড়, কিন্তু মাথায় চুল নেই। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কামিয়ে রাখে। বলে, পাগড়ি বাঁধতে সুবিধে হয়। এই লোকটাও আমার কথা ভাবে, সঙ্গ দিতে আসে। হেসে বললুম: কী খবর, সোহন?

এইটুকু সময়ের মধ্যে সোহন যে অনেক খবর সংগ্রহ করেছে, তা আমি জানি। ও দলের খালাসিদের সঙ্গে জোরে জোরে গল্প করছিল। কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে। কিন্তু সোহন প্রথমটায় উত্তর দিল না।

বললুম: কারণবাবা নাকি মস্ত তান্ত্রিক।

আস্তে আস্তে সোহন বলল: কাপালিক।

তান্ত্রিক আর কাপালিকের প্রভেদ আমি বুঝিনা। গোবিন্দ একবার আমাকে ভাল করে বুঝিয়েছিল। কিন্তু আমি ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করিনি। শুধু অভিধানের মানেটা আমার মনে আছে—নরকপালধারী তান্ত্রিক বিশেষ। এসব কথা একবার শুনলেই সাধারণত মনে থাকে। আমারও থাকত। কিন্তু গোবিন্দ সেই সময় এত বাড়াবাড়ি করছিল যে আমি তার কোন কথাই ভাল করে শুনতুম না। আজকে তবু গভীর বিস্ময়ের ভান করে বললুম: আচ্ছা?

কাপালিক সম্বন্ধে সোহনের কী ধারণা জানিনে। কিন্তু উৎসাহ পেয়ে বলল: হাঁ হুজুর।

বেশি কথা বলার অবকাশ আমার নেই। সোহন তা বোঝে।

বলল ঃ হুজুর, কাপালিকের চোখ চুম্বক-লোহার মতো। একবার চোখে চোখ পড়ল কি সর্বনাশ। যত বড় মরদ হক না কেন, তাকে টানবেই।

বললুম ঃ বটে!

পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে উত্তর দিল ঃ হাঁ হুজুর। আমাদের গ্রামে একবার কাপালিক এসেছিলেন। আমরা তখন ছোট ছোট। শুনেছি, সেদিন ছিল অমাবস্যার সন্ধ্যা। বেছে বেছে একটা জোয়ানকে বাবা পছন্দ করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল্। আর কোন কথা নয় হুজুর, সে লোকটা ভেড়ার মতো পিছন পিছন চলল। গ্রামের লোক তার হাত ধরে কত টানাটানি। কিছুতেই কিছু হলনা।

খেতে খেতে আমি বললুম ঃ তারপর?

তারপর হুজুর কী বলব! একেবারে গ্রামের সীমার বাইরে জঙ্গলের ভিতর ঢুকল কাপালিক-বাবার পিছনে। বাবা হাত পা ধুয়ে পূজোয় বসলেন, ঐ লোকটা কাছেই বসে রইল। শেষরাতে যখন পূজো শেষ হল, বাবা বললেন, যা ঐ ডোবায় একটা ডুব দিয়ে আয়। তখুনি সে স্নান করে এল। বাবা বললেন, এইখানে বোস্। সে-ও তাঁর কাছে গিয়ে বসল। বাবা ফুলচন্দন দিয়ে তাকে উৎসর্গ করলেন। তারপর এক ঘটি কারণ-জল আর খাঁড়া হাতে নিয়ে বললেন, ঐ হাড়-কাঠে গলা দে।

অবিশ্বাসের সুরে আমি বললুম ঃ বল কি সোহন!

ঠিক বলছি হুজুর। একটুও বানিয়ে বলছিনা। লোকটা কোন আপত্তি করলনা। সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল।

শিহরে উঠে আমি বললুম ঃ থাক্ থাক্, আর বলতে হবেনা।

বাকিটুকু সোহন আর বললনা। তবে বুঝতে পারলুম যে এই গল্প সে মনেপ্রাণে সত্য বলে স্বীকার করে। আমি বিশ্বাস করিনা

বললে সে মানবেনা। বরং আরও যুক্তি দিয়ে তর্ক করে সে আমাকে মানাতে চেষ্টা করবে। তাই আমি গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করলুম না।

সোহন নিজেই বলল: যা শুনলুম হুজুর, এই কারণবাবাও অমনি ক্ষমতা ধরেন। সেখানে ছোট মেয়েটা যা বলল, তা মিথ্যে নয়। পুজোর জন্যে ওর দিদিটাকে ধরে নিয়ে গেছেন। একদিন গ্রামে এসে খুঁজে খুঁজে ঐ মেয়েটাকে পছন্দ করেন। তারপর তার চোখের দিকে এমন করে তাকালেন যে মেয়েটা আর ঘরে থাকতে পারলনা। বলতে গেলে এখন কারণবাবার সঙ্গেই ঘর করছে।

বললুম: চল্, একদিন যাওয়া যাক তার আশ্রমে।

সোহন নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম: ভয় করবে নাকি?

সোহন বলল: ভয়ের কথা নয় হুজুর, ভাবনার কথা। ও সব জায়গায় না গেলেই ভাল।

সন্ধ্যেবেলায় ড্রয়িংটেবলে বসে আমি কাজ করছিলুম। হিসেব-নিকেশ প্লটিং ও ড্রয়িং। কালকের কাজও বাকি ছিল। শেষ করতে তাই দেরি হচ্ছিল। খালাসিরা তাদের খাওয়াদাওয়া শেষ করেছে। বাহিরে পেট্রম্যাক্সের নিচে তারা সোহনের রামায়ণপাঠ শুনতে বসেছে। সবাই বসেনা। বসে তারই বয়সী জনকয়েক মানুষ। দু-একজন নাকি পাশের গ্রামেও যায় সান্ধ্যভ্রমণে। রাতে দেরি করে ফেরে। আমার মন মাঝে মাঝে ওদের দিকেও চলে যায়।

সোহন তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে। রামচরিতমানস। বড় সহজ মিষ্টি ভাষা। হিন্দীকে সব সময় হিন্দী মনে হয়না। যেমন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী। সোহনের গলাটিও মিষ্টি। পড়ে দরদ দিয়ে। আজ অরণ্যকাণ্ড পড়ছে।—

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন্হ মহঁ অতি দারুন দুখদ মায়ারূপী নারি॥

সোহন এসবের মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে।—কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার এ সমস্তই মোহের প্রবল সৈন্য। আর এদের মধ্যে মায়ারূপী নারী দারুণ দুঃখদায়ক।

সুনু মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা।
মোহ বিপিন কহুঁ নারি বসন্তা॥
জপতপ নেম জলাশ্রয় ঝারী।
হোই গ্রীষম সোখই সব নারী॥

শোন মুনি, পুরাণ শ্রুতি ও সাধুরা বলেন যে মোহ-বনে নারী হল বসন্ত। জপতপ নিয়ম যদি জলাশয় হয়, তবে নারী হল শোষণকারী গ্রীষ্ম।

তুলসীদাস এইখানেই ক্ষান্ত হননি। শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেছেন নারীর উপর। সমস্ত ঋতুর সঙ্গে নারীর তুলনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বললেন—

দীপ সিখা সম জুবতি জন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ॥

যুবতী নারী প্রদীপের শিখার মতো, ওরে মন, তাতে পতঙ্গের মতো উড়ে পড়তে চেয়োনা। সদা সৎসঙ্গ কর, ও কাম মদ ত্যাগ করে রামের ভজনা কর।

সোহন পড়ল: ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকল কলি কলুষ বিধ্বংসনে বিমল বৈরাগ্য সম্পাদনো নাম তৃতীয়ঃ সোপানঃ অরণ্যকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

আমাদের অরণ্যকাণ্ডের তো সবে শুরু। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে এ অরণ্য মোহের নয়, আর বসন্ত জাগেনি নারীর পদক্ষেপে। তারপরেই মনে এল সেই ছোট মেয়েটির কথা, আর তার দিদির কথা। তার

দিদিকে আমি দেখিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে, ছোট বোনের মতো সে আর নাবালিকা নয়। বসন্ত যদি জেগে থাকে তো সে ঐ কারণবাবার আশ্রমে।

এক সময় সোহন এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়ে বললুম: কী খবর?

সোহন চিন্তিত ভাবে বলল: ব্যাপারটা হুজুর ভাল মনে হচ্ছেনা।

কেন?

রাত তো অনেক হল।

এই রাতের কথায় আমার গোবিন্দর কথা মনে পড়ল। সে এখনও ফেরেনি। এবারে তার খোঁজ করা দরকার। রাত বাড়লে আমাদেরও দুর্ভোগ বাড়বে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম: চল।

সোহন বলল: আপনি কেন কষ্ট করবেন হুজুর! রাম সিংকে নিয়ে আমরা বেরুই।

আমার মন মানলনা। বললুম: রাম সিং ক্যাম্পের পাহারায় থাক্। আমি যাব।

আমাদের একজনকে দরকার বন্দুকের জন্য। বন্দুকটা সঙ্গে থাকলে ওদের সাহস থাকে। আমার কাগজপত্র আমি গুটিয়ে রাখলুম, বন্দুকটা নিলুম বিছানার তলা থেকে। আর এক হাতে টর্চ নিলুম। লাঠি আর লণ্ঠন হাতে সোহনরা দুজন তৈরি ছিল। 'রাম রাম' বলে বেরিয়ে পড়া গেল।

গোবিন্দকে নিয়ে পারা যায়না!

চার

গোবিন্দকে খুঁজতে আমাদের বেশি দূর যেতে হল না। নদীর ধারেই তার দেখা পাওয়া গেল। টর্চের আলো ফেলে আমি এগোচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল যেন কিছু দেখতে পেয়েছি। ভাল করে আলো ফেলতেই সন্দেহ দূর হল। নদীর দিকে মুখ করে গোবিন্দ বসে আছে। আলো দেখতে পেয়েছে কিনা জানিনা, পিছনে ভ্রূক্ষেপ করলনা।

আর আমি বাতি জ্বাললুম না। লণ্ঠনের স্বল্প আলোতেই বাকি পথটুকু এগিয়ে গেলুম।

আমার পায়ের শব্দে গোবিন্দর ধ্যান ভঙ্গ হলনা। আমি দেখলুম, সে তার দুচোখের পূর্ণ দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করে অন্ধকারের রূপ দেখছে। নিশ্চয়ই শুধু ভাবছেনা। তাহলে তার দৃষ্টি এক জায়গাতেই স্তব্ধ হয়ে থাকত। সে চারিদিকে তাকাচ্ছে, উপরে নিচে দক্ষিণে ও বামে। তাকাচ্ছে নদীর জলে গাছের পাতায় ও আকাশের তারায়। মনে হল, সে তাদের সঙ্গে কথা কইছে। তাদের ভাব বিনিময় হচ্ছে আদিম ভাষায়। নিঃশব্দ ভাষা।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম গোবিন্দকে। গোবিন্দ যেন কবি, এখন সে সব ভুলে গেছে, দেশ কাল সমাজের কথা, এমনকি নিজের কথাও। ক্যাম্পে ফেরার কথা তার মনে পড়ছেনা। ক্যাম্পের কথাই হয়তো ভুলে গেছে। তাকে জাগিয়ে না দিলে কিছুই তার মনে পড়বেনা। আস্তে আস্তে ডাকলুম : গোবিন্দ !

গোবিন্দ চমকে উঠল। বাস্তব জগতে ফিরে এসেও যেন এলনা। নিজের হাতটা মাটির উপর ঠুকে ইঙ্গিতে আমায় বসতে বলল।

বললুম ঃ আর কত রাত এখানে বসে থাকবে ?

উত্তরে গোবিন্দ বলল ঃ আর একটু বসব।

আমি জানি, এই মুহূর্তে তাকে তোলা যাবেনা। তাই পিছন ফিরে সোহনদের বললুম ফিরে যেতে। ওরা প্রতিবাদ করতে জানেনা। তাই ফিরে গেল। আমি এসে গোবিন্দর পাশে বসলুম।

গোবিন্দ কোন কথা বলল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম ঃ বল কী বলবে!

গোবিন্দ বলল ঃ পৃথিবীটাকে আজ নতুন মনে হচ্ছে।

আমি জানতুম, আজ তার কাছে এইরকমের কথাই শুনতে পাব। বললুম ঃ পৃথিবী তো রোজই নতুন। কোন দিন কি পুরনো হয়!

গোবিন্দ তখনি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম ঃ পুরনো যা হয়, সে আমাদের ক্যাম্প, আর কাজ। কয়েকদিন যেতে না যেতেই বড় একঘেয়ে লাগে।

সেই সঙ্গেই যোগ করলুম ঃ চল, এইবার ঘরে ফিরি।

আমি উঠতে যাচ্ছিলুম। গোবিন্দ আমার হাত চেপে ধরল। বলল ঃ আর একটু ব'সো।

আমি বসতেই জিজ্ঞাসা করল ঃ আমার কেন নূতন মনে হচ্ছে, তা জানতে চাইলেনা ?

বললুম ঃ কবির চোখই অমনি। পুরনো জিনিসকে প্রতিদিন নতুন দেখে, আর পুরনো কথাকে বার বার নূতন করে বলে।

মাথা নেড়ে গোবিন্দ বলল ঃ হলনা। আজ আমি নূতন জিনিসই দেখতে পেয়েছি। একেবারে নূতন। এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার ছিলনা।

ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করলুম ঃ তুমি কি কারণবাবার আশ্রমে গিয়েছিলে?

গোবিন্দ সংক্ষেপে উত্তর দিল ঃ হুঁ।

তুমি তাহলে সেই মেয়েটার কথা ভাবছ ?

সেই মেয়েটা!

গোবিন্দ চমকে উঠল।

বললুম : পেমার দিদি তো!

গোবিন্দ আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম : পেমাকে তুমি চিনবেনা। এই গ্রামেরই মেয়ে। কারণ-বাবা তার দিদিটাকে ধরে নিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ আপত্তি জানাল, বলল : ধরে কেন নিয়ে যাবেন। সে নিজেই গেছে। তাড়িয়ে দিলেও কি সে কখনও ফিরে যাবে!

আশ্চর্য হয়ে বললুম : বল কি!

গোবিন্দ কোন উত্তর দিল না।

বললুম : মেয়েটা ওখানে কী করে?

গোবিন্দ ধীরে ধীরে আবৃত্তি করল :

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ
বিশেষবৈদগ্ধযুতা সর্বা এব কুলাঙ্গনা॥
রূপযৌবনসম্পন্না শীল-সৌভাগ্য-শালিনী।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌॥

এই শ্লোকটি গোবিন্দর মুখে আমি আগে অনেকবার শুনেছি - তখন সে তন্ত্রের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করত। সময়াচার তন্ত্র, আচার ভেদ তন্ত্র, গুপ্তসাধন তন্ত্র, নিরুত্তর-উত্তর তন্ত্র, শ্যামা-রহস্য, কুলার্ণব প্রভৃতি নানা প্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। তখন সে এই সমস্ত শ্লোক আমাকে রহস্যচ্ছলে শুনিয়েছে। মানেও বুঝিয়ে দিয়েছে। তারপর যখন নিজে ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছে তান্ত্রিক ধরে, তখন আর তার মুখে তামাসা শুনিনি। এ সবের তখন সে অন্য ব্যাখ্যা করেছে। দার্শনিক ব্যাখ্যা। সে সব আমার মনে নেই।

গোবিন্দ বলল : নবকন্যার কথা তোমাকে আমি বলেছিলুম। সযত্নে নবকন্যার পুজা করলে নিশ্চিত সিদ্ধি হবে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : এ তো কারণবাবার কথা। রূপযৌবন-সম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী কন্যার পূজো করে তিনি নিজে সিদ্ধিলাভ করবেন। কিন্তু মেয়েটার কী লাভ হবে? স্বজন সংসার ছেড়ে গভীর বনের ভেতর এই যে তার নির্বাসন, সে তার কী মূল্য পাচ্ছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বলল : সে কথা তুমি গুপ্তসাধন তন্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা ক'রো, যিনি ঐ শ্লোক রচনা করেছেন।

মেয়েটিকে কেন জিজ্ঞাসা করলে না?

আমি জানতে চাইলুম।

গোবিন্দ বলল : তার সময় এখনও হয়নি।

কোনদিন হবে কি?

জানিনে।

অনেকক্ষণ থেমে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করলুম : কারণবাবাকে তোমার কেমন লাগল?

গোবিন্দ বলল : কঠিন প্রশ্ন।

বললুম : তাঁর শক্তির বিচারে নয়, মানুষ হিসেবে?

গোবিন্দ বলল : কঠিন মনে হল। স্নেহের সংবাদ কোনখানে পেলুম না।

সাধনার কথা?

বললেন না। তবে আমার মনে হল তিনি কৌলাচারী। স্থানকাল কর্মাকর্মের কোন বিচার নেই। তাঁর আচরণে আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল।

বললুম : ভাই, আচার-আচরণের কথা আমি ভুলে গেছি। কয়েকটা নাম শুধু মনে আছে।

গোবিন্দ বলল ঃ আবার আমাকে বলতে হবে ?

সে তোমার ইচ্ছা।

গোবিন্দ ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বলল ঃ বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার শাক্তাচার ও দক্ষিণাচার। এই পর্যন্তই ভাল। রাতে সাধন ভজন নিষেধ, শুধু মাত্র জপ চলতে পারে। বৈষ্ণবাচারে তো রাতে মালা বা যন্ত্র পর্যন্ত স্পর্শ করা নিষেধ। স্বাধীনতা শুরু হল বামাচার থেকে। পঞ্চতত্ত্ব ও খ-পুষ্পের ব্যবহার, কুলস্ত্রীর পূজা— সবই বিধেয়। পরমা শক্তির পূজা করতে হবে বামাস্বরূপা হয়ে। তারপর পশ্বাচার, বীরাচার ও সিদ্ধান্তাচার। শোধন করলেই সব দ্রব্য শুদ্ধ হয়। কাজেই কোন আচার মানবার প্রয়োজন নেই। কৌলাচার আসে সকলের শেষে—

অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

এটা শ্যামা-রহস্যের কথা। যাঁরা অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভায় বৈষ্ণব, নানাবেশধারী এই যোগীই কৌল। কৌলের ভেদ জ্ঞান নেই। কর্দম ও চন্দনে, কাঞ্চনে ও তৃণে, পুত্র ও শত্রুতে, এমনকি গৃহে ও শ্মশানে কোন প্রভেদ দেখেন না। এঁরা কোথাও শিষ্ট, কোথাও ভ্রষ্ট। ভূত-পিশাচের মতো এঁদের বিহার ও বিচরণ।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কারণবাবাকে কৌল বলে কেন সন্দেহ করছ ?

গোবিন্দ বলল ঃ কারণে তিনি ডুবে আছেন, আর রাতে তাঁর কুলক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থা দেখলুম।

কুলক্রিয়ার গল্পও তার কাছে শুনেছিলুম। আজ মনে নেই। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করলে আর রক্ষা থাকবে না। এই নদীর ধারে বোঝাতে শুরু করলে রাত এখানেই ভোর হবে। তাই বললুম ঃ এবারে বাড়ি চল।

বাড়ি আবার কোথায় ?

ঐ হল। আমাদের তাঁবুর কি কোন টান নেই?

গোবিন্দর উঠবার ইচ্ছা ছিল না। এক রকম জোর করেই তাকে টেনে তুললুম। বলল: একটা কথা বলবে ভাই?

কেন বলব না!

ওই মেয়েটার সম্বন্ধে কী শুনেছ বল।

হেসে বললুম: সবই তো বলেছি।

ব্যস?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম: ঐটুকুই।

গোবিন্দর এই কৌতূহল আমার ভাল লাগল না। তার চিন্তার পরিধি বড় বিস্তৃত। কল্পনার কোন সীমা নেই। এই মেয়েটার সম্বন্ধে সে কী ভাবছে, সেই জানে। তবু আমার মনে হল যে সে অনেক কিছু ভাবছে। এই ভাবনা তাকে পীড়িত করবে। হয়তো বা অকল্যাণের পথে টানবে। গোবিন্দর নীতিবোধ আছে, ধর্মবোধও। ধর্ম তাকে কারণবাবার আশ্রমে টানবে। কারণবাবা তান্ত্রিক। তাঁর স্ত্রীচক্র লতাসাধন প্রভৃতি কতরকম সাধনা আছে জানিনে। গোবিন্দ একবার তার মধ্যে পড়লে ভবিষ্যৎ বড় আশঙ্কার। তন্ত্রসাধনায় নীতির অভাব আছে বলে আমার বিশ্বাস। বাহির থেকে সকলেরই তাই মনে হবে। এ সবের দার্শনিক তত্ত্ব কেউ বলে দিলে হয়তো আমার বিশ্বাস বদলাবে। কিন্তু এখন তো উদ্বেগ বাড়ল।

গোবিন্দ বলল: কথা বলছ না যে?

সত্য কথাটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: বড় ভয় হচ্ছে।

গোবিন্দ হেসে উঠল হা-হা করে। চারিদিকের অরণ্যে তার প্রতিধ্বনি উঠল।

ভূতো আমার পিছনে ছিল। ডেকে উঠল: ঘেউ ঘেউ।

পাঁচ

তান্ত্রিকদের গোপন ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল আমার কারও চেয়ে কম নয়। স্ত্রীচক্রে নাকি একজন করে পুরুষ ও নারী পাশাপাশি চক্রাকারে বসে। মাঝখানে আর একজন নারী। পুরুষের সঙ্গিনী হলেন শক্তি বা ভৈরবী। আর মাঝখানের নারীকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করতে হবে। গোবিন্দর কাছেই এই সমস্ত শুনেছিলুম। কিন্তু ভাল করে কৌতূহল মিটিয়ে শুনতে পাইনি। আমার মনের ভিতর অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পাছে গোবিন্দ আরও জড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে আমি আমার সমস্ত কৌতূহল দমন করেছি। আজও করি।

একসময় কিছু বাংলা বই সংগ্রহ করে পড়েছি। সাধু-সন্ন্যাসীর লেখা বই, এবং সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে লেখা বই। তাতে অনেক অলৌকিক ও আজগুবি ক্রিয়াকলাপের গল্প জেনেছি। কিংবা অনেক ফাঁকির গল্প। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে সে সব কথা মেনে নিতে মন চায়নি। সাধন-প্রণালীর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা উচিত। তবেই তাতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। কোন বিশ্বাসের পিছনে যুক্তির অভাব দেখলেই তাকে আমরা কুসংস্কার বলে অবহেলা করি।

গোবিন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে বলল ঃ কী ভাবছ ?

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম ঃ কিছু না।

গোবিন্দ হাসল ; বলল ঃ ভয়ের কী আছে ?

কে বলল আমি ভয় পেয়েছি ?

ভয় না পেলে কি কেউ ভাবনার কথা চেপে যায় ?

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না। কিন্তু গোবিন্দ বলল ঃ তোমার ভাবনার কথা আমি জানি।

আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন জানালুম।

গোবিন্দ বলল: তোমার ভাবনা আমার জন্যে। ভাবছ, একবার ঐ চক্রে ভিড়ে গেলে তোমার দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। সেবারের কথা তো একেবারে ভুলিনি।

একটু থেমে বলল: এ পথে খানিকটা এগিয়েছিলুম। ক্রিয়া-কর্ম শিখতে আমার বাকি ছিল না। যা বাকি ছিল তা হল এ সবের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ঐটুকুরই আমার লোভ ছিল, ঐটুকু মিটলে আমি শান্তি পেতুম।

তাকে নিরুৎসাহ করবার জন্য বললুম: সে রকম কিছু থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পেতে। নেই বলেই পাওনি।

বাধা দিয়ে গোবিন্দ বলল: ভুল হল। কোন জিনিস ভাল করে না জেনে সমালোচনা করতে নেই। এতদিন চেষ্টা করেও আমি যা জানতে পারিনি, তুমি কিছু না জেনে সে সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রোনা।

তবু আমি নিরস্ত হলুম না। বললুম: ঐ তো মজা। কিছু আছে ভেবেই লোকে হয়রান হচ্ছে।

কিছু জানতে গেলেই হয়রান হতে হয়। সেটা ভাল লক্ষণ।

আমার মনে হল, গোবিন্দর বাসনা এখনও অপূর্ণ আছে। সুযোগ পেলে আবার সে ঐ চক্রে গিয়ে যোগ দেবে। সে কি সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করছে! বললুম: জানবার অনেক জিনিস আছে গোবিন্দ, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে জীবনটা নষ্ট না করলেও চলবে।

একে তুমি জীবন-নষ্ট বল?

নষ্ট নয়! অনাচার বলে যা আমরা ঘৃণা করি, ধর্মের নামে তাই তোমরা প্রশ্রয় দিচ্ছ। এই যে কিছুক্ষণ আগে তুমি নবকন্যার নাম করলে, কী দরকার ঐ নবকন্যা নিয়ে মাতামাতি করবার! এ সবের মানে কি আমরা বুঝি না? ধর্মের নামে ব্যভিচারের ছাড়পত্র নিচ্ছ।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। তাই থামতে পারলুম না: তোমার ঐ শ্লোকটা বল তো, যাতে চক্রে বসে পরের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভাববার স্বাধীনতা আছে।

গোবিন্দ চুপ করে ছিল। বললুম: ভয় পাচ্ছ কেন, বল না!

এ সমস্ত কথা গোবিন্দর কাছেই আমি শুনেছিলুম। তখন সে আমাকে তামাসা করে সব কিছু শুনিয়েছিল। কিন্তু আজ চুপ করে রইল। আমি মনে করবার চেষ্টা করলুম:

স পতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ।

গোবিন্দ বলল: প্রথম লাইনটা বাদ গেল।

বল না, তোমাকেই তো বলতে বলছি।

নিতান্ত অনিচ্ছায় গোবিন্দ বলল:

অগমোক্ত পতিঃ শম্ভুরাগমোক্ত পতির্গুরুঃ।
স পতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ॥
বিবাহিত পতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চনে।
বিবাহিতং পতিং নৈব ত্যজেদ্বেদোক্ত কর্মণি॥

নাকটা কুঁচকে বললুম: কী ব্যাপার দেখ! চক্র করে বসলে বিবাহিত স্বামী আর স্বামী থাকবে না। তখন চক্রগত সমস্ত পুরুষেরই মনোরঞ্জন করা চলবে। মরি মরি!

গোবিন্দ বলল: কিন্তু সেইটাই তো শেষ কথা নয়! বেদোক্ত কর্মে যে বিবাহিত পতিত্যাগ বিহিত নয়, তাও বলা হয়েছে।

বললুম: সমাজে যা ব্যভিচার বলে নিন্দিত, তন্ত্রমতে কেন তা প্রশ্রয় পাবে?

গোবিন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারল না। বললুম: এ কথার সদুত্তর যেদিন তুমি দেবে, সেদিন তোমার কাজ আমি সমর্থন করব।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে গোবিন্দ বলল: চল, তোমাকে কারণবাবার কাছে একদিন নিয়ে যাই। তাঁকেই তুমি এই প্রশ্ন ক'রো।

প্রশ্ন আমি তোমাকে করব। এর পেছনে অনেক সময় তুমি নষ্ট করেছ।

গোবিন্দ বলল : বেদবিহিত আচারকেই তন্ত্রমতে পশ্বাচার বলে। কারণ চার বেদেই নাকি পশুভাব প্রতিষ্ঠিত।

আমি উত্তর দিলুম : এ তোমার তন্ত্রমত। আমার মতে তন্ত্রের আচারই পশ্বাচার। মানুষের আচার হলে খানিকটা ঢাকাঢাকি চক্ষুলজ্জা থাকত। অমন নির্বিকার ভাবে বলতে পারতনা যে চক্রগত সমস্ত পুরুষ সমস্ত কুলস্ত্রীর পতি, আর বিবাহিত পতি কেউ নয়। তোমাদের লজ্জা করে না?

গোবিন্দ বলল : তুমি যা বলছ, তা উত্তর আর নিরুত্তর তন্ত্রের কথা। তন্ত্রে তন্ত্রে মতভেদ আছে।

স্মরণ করে বলল : ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলে যে বামাচারীর নরক অনিবার্য।

সে তো পুরাণের কথা, তন্ত্রের নয়।

আমি উত্তর দিলুম।

গোবিন্দ বলল : তন্ত্রসারেও কতকটা সেই কথাই আছে।

একটু চিন্তা করে বলল :

> ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেবৈ কদাচন।
> বামকামো ব্রাহ্মণোহি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥

জিজ্ঞাসা করলুম : এ কথা কি কোন ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক মানেন?

গোবিন্দ সংক্ষেপে উত্তর দিল : জানিনে।

তর্কে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। বরং মনে হয়েছিল যে এখান থেকে সরে গেলে তন্ত্র নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করব।

একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। সেই প্রথম রাত্রির ঘটনা। তাকে বিভ্রম বলে উড়িয়ে দিতে না পেরে মনে মনে বড় অশান্তি বোধ

করছিলুম। সত্য বলে মেনে নিতে পারলেও খানিকটা আরাম পেতুম! আমি জানি, নিজের অজ্ঞাতসারে প্রতি রাত্রে আমি কান পেতেছি। রাতে ঘুম ভেঙে গেলেও নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কারও পদশব্দের অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তার পরে ভূতো আর ডাকেনি। আমরাও ঘুমিয়েছি নিশ্চিন্তে। মনে হচ্ছে যে দুশ্চিন্তা করবার মতো কোন ঘটনা বোধহয় এখানে ঘটেনি।

আমাকে শোবার উদ্যোগ করতে দেখে গোবিন্দ হাসল।

বললুম ঃ হাসলে যে!

এমনি।

এমনিতে তো পাগলে হাসে।

গোবিন্দ হেসে বলল ঃ আমরাও তো পাগল।

হুঁ।

বলে আমি শুয়ে পড়লুম।

গোবিন্দ শুলনা।

বাহিরে রাত আজ বড় অন্ধকার। আমার ভাবনাও অন্ধকারের পথ ধরেছে।

ছয়

পেমার দিদির নাম হল সোমা। বয়স উনিশ-কুড়ি। যে বয়সে শ্বশুর-ঘর করতে যেত সগৌরবে, সেই বয়সেই কারণবাবার আশ্রমে এসে ঢুকেছে। এ মুল্লুকে কারণবাবা তখন নূতন এসেছেন। একেবারে একা। সোমা এসে তাঁর সংসার দেখার ভার নিল। সোমার বাবা-মা কান্নাকাটি করেছিল। থানা-পুলিশও বোধহয় বাকি রাখেনি। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। কারণবাবা সিদ্ধপুরুষ, মারণ উচাটন জানেন। শুধুমাত্র ইচ্ছার অপেক্ষা। তাঁর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, চোখে চোখ তুলে চাইবে, এমন মানুষ এ তল্লাটে নেই।

সোমাকে আমি দূর থেকে দেখলুম। সে এসেছিল নদীতে জল নিতে। ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে। কাজ-কর্ম শেষ করে আমি একা গিয়েছিলুম কারণবাবার আশ্রমের দিকে। আশ্রমে যাইনি, নদীর তীরে বসে গোবিন্দর অপেক্ষায় ছিলুম। সে আজকাল রোজ আশ্রমে যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে অন্তর্যাগ শেখে। আমি শুধাই, কার কাছে। সোমার কাছে নিশ্চয়ই। প্রশ্ন শুনে সে হাসে, উত্তর দেয়না। উত্তরটা আমি কল্পনা করে নিই।

কাল জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেমন দেখতে? দেখবি?—গোবিন্দ জানতে চেয়েছিল। বলেছিলুম, আশ্রমে যাবার সাহস নেই। তবে পথের ধারেই বসে থাকিস।—গোবিন্দ পরামর্শ দিয়েছিল। আজ আশ্রমে যাবার পথে গোবিন্দ আমাকে এইখানে বসিয়ে রেখে গেছে। এইখানে বসেই সোমাকে দেখতে পেলুম।

কলসীতে জল ভরেই মেয়েটা গেলনা। উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে সেদিকে চাইতে লাগল। আমার মনে হল, সে আমাকেই খুঁজছে।

বিচিত্র নয়। গোবিন্দ হয়তো বলেই পাঠিয়েছে। আমি এগিয়ে গেলুম।

সোমা তার শাড়ির আঁচল আরও একটু সামলে নিল।

কাছে গিয়ে আমি গোবিন্দর কথা জিজ্ঞাসা করলুম। সোমা লজ্জা পেল, বলল ঃ আশ্রমে আছে।

আমি তার লজ্জা দেখে হাসলুম।

মেয়েটা পালিয়ে গেল।

আমি তাকে আটকাতে পারতুম। কথা বলে, কিংবা পথ আগলে। হাত বাড়ালেও তার নাগাল পেতুম। এই নির্জন নদীর তীরে, সভ্যজগতের রীতিনীতির বাহিরে, মানুষের চোখের আড়ালে আমি আদিম মানুষের মতো সহজ চোখে সোমাকে দেখতে পারতুম। আমি জানি, সোমা তাতে আপত্তি করতনা। তার দৃষ্টিতে আমি সুস্থ জীবনের তৃষ্ণা দেখেছি। গোবিন্দর নামে এইজন্যই সে লজ্জা পেয়েছে। এত সহজে ধরা দিতে তার একটুও দ্বিধা হয়নি। তবু আমি শুধু হাসলুম। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাসলুম। যেতে তাকে বারণ করলুম না, হাত বাড়িয়ে পথ রোধ করলুম না।

সোমা চলে গেল। তরতর করে লাফিয়ে লাফিয়ে গেল। পিছনে একবার তাকিয়েও গেল। কটাক্ষ হেনে গেল কিনা, দেখতে পেলুমনা।

রাতে তাঁবুতে ফিরে গোবিন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ দেখলে?

বললুম ঃ সঙ্গে নিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে।

গোবিন্দ বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হল। বলল ঃ ঠিক বলছ?

হেসে বললুম ঃ ভয় নেই, আমি তাকে নিয়ে পালাবনা। বলছি, কেউ যদি পালায় তাহলে তার পছন্দের প্রশংসা করব।

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলল ঃ হুঁ।

জিজ্ঞাসা করলুম : ঠিক বলিনি ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ বলল : কারণবাবা কী বলছিলেন জান ?

জানিনা।

আমার জানবার কথাও নয়। ও দিকই আমি মাড়াইনি। গোবিন্দও সে কথা জানে। প্রশ্নটা উত্তরের আশায় না হলেও আমি উত্তর দিলুম।

গোবিন্দ বলল : বাবা বলছিলেন সোমার মতো আর একটি মেয়ের কথা। তখন তিনি হিমালয়ের অন্যত্র থাকতেন। সেইখানে তাঁর আশ্রম রক্ষা করত। কেউ দেখা করতে এলে মুগ্ধ হত সেই মেয়ের রূপ দেখে। ধর্মকর্মের কথা ভুলে যেত। মানুষ ভুল করে। কৌলের লতাসাধনে যে নারীর ব্যবহার, সে আর সাধারণ নারী নয়। তার মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব হয়েছে, ভগবতীর আধার সে। তাকে কামনা করলে পুরুষের মঙ্গল নেই। ভগবতী তাকে শাস্তি দেবেন।

লতাসাধন আমি জানিনা। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলুম না। গোবিন্দ বলল : বাবা বললেন, অনেকগুলো মানুষ নাকি বেঘোরে মারা পড়েছে। মৃত্যুর সে সব বীভৎস গল্প। শুনলে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

বললুম : মেয়েটার কিছু হয়না ?

গোবিন্দ বলল : শেষবারে মেয়েটাও নাকি পাপ করেছিল। তার ফল পেয়েছে হাতে হাতে।

কী ফল শোনবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করলুম। কিন্তু গোবিন্দ সে গল্প জানেনা। বলল : সোমা সে গল্প জানে।

বললুম : বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

বললুম : তুমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে তোমার

মঙ্গল হবেনা। আর মেয়েটা যদি তোমাকে প্রশ্রয় দেবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকেও শাস্তি পেতে হবে, এই তো?

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে রইল।

বললুম: বাঘের খাঁচায় হাত বাড়িয়েছ, সামলাতে পারবে তো?

তুমি কি তামাসা করছ আমার সঙ্গে?

আমি জানতুম, প্রশ্নটা তামাসার মতো শোনাবে। সোমা এই গ্রামেরই একটি পাহাড়ী মেয়ে। চঞ্চল কোমল সুন্দর মেয়ে। তাকে নিয়ে রসিকতা করা যায়, ঘর করার কথা ভাবা যায়না। তরল পরিহাস আর গভীর জীবনযাত্রা কখনও এক নয়। কারণবাবার আশ্রমে সোমা বাঁধা পড়েছে। বৃদ্ধের লতাসাধনে সে ভগবতী সেজে বসেছে। বসুক। গোবিন্দ তাকে নিয়ে কী করবে? মোহ? আমার মনে হয়না, গোবিন্দ এত ঠুনকো। তবে কি সে মেয়েটাকে রক্ষা করতে চায়? এই অসুস্থ জীবন থেকে বার করে তাকে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে? কেন, কী জন্য সে এই অসাধ্য সাধনে জীবনকে বিপন্ন করতে যাবে! আবার সেই মোহের কথা এসে পড়ে। সোমাকে দেখে গোবিন্দর ভাল লেগেছে। সোমার ভাল করতে সে চায়। একটা অসহায় মেয়ের মঙ্গল করতে গিয়ে জীবন যদি বিপন্ন হয় হোক। এ তো মানুষেরই কাজ!

আপত্তি জানিয়ে বললুম: তামাসা কেন করব!

তাই তো মনে হচ্ছে।

বললুম: দুঃসাহসের কাজ করছ, তাই সাবধান করে দেবার দরকার মনে করছি।

বাহিরে সোহনের গলা শোনা যাচ্ছিল। সে রামায়ণ পাঠ করছে। মনে মনে আমি তার পরিবেশটি কল্পনা করতে পারি। জনকয়েক তারই মতো প্রৌঢ় মানুষ তাকে ঘিরে বসেছে। মাঝখানে সোহন। উপরে পেট্রম্যাক্স বাতি দিনের মতো আলো করে রেখেছে

চারিদিক। আর সোহন তার জনকয়েক অশিক্ষিত সঙ্গীকে কিছু আলো বিতরণের চেষ্টা করছে।

সেদিনের সন্ধ্যার কথা আমার মনে পড়ল। সোহন অরণ্য কাণ্ড পড়ছিল। তুলসীদাস নারীর সম্বন্ধে কতগুলি মূল্যবান শ্লোক রচনা করেছেন। সোহনরা একাধিকবার এই শ্লোক পড়ে। বাড়ির জন্য মন কেমন করলেই বোধহয় পড়ে। কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা। আমি জানি, যে কদিন তারা বাড়িতে থাকবে, এসব শ্লোকের একটাও তাদের মনে থাকবেনা।

শুনে শুনে আমারও কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ হয়ে গেছে। তারই একটা হঠাৎ মনে পড়ল ঃ

দীপ শিখা সম জুবতি জন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ॥

যুবতী নারী প্রদীপের শিখার মতো। ওরে মন, তাতে পতঙ্গের মতো উড়ে পড়তে চেয়োনা। তারই সঙ্গে উপদেশ আছে বাঁধা। সদা সৎসঙ্গ কর, আর কাম মদ ত্যাগ করে রামের ভজনা কর।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন্‌টা দুঃসাহসের কাজ?

কোন্‌টা ঃ হাসতে হাসতে আমি বললুম ঃ

দীপ শিখা সম জুবতি জন মন জনি হোসি পতঙ্গ।

এ শ্লোক গোবিন্দও অনেকবার শুনেছে। তাকে মানে বলে দেবার দরকার নেই। গম্ভীরভাবে সে বলল ঃ হুঁ।

কথাটা মানলে তো?

না।

না কেন?

যুবতী জন এখানে নিজেই যে জ্বলছে। পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবে।

তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে?

মাথা নেড়ে গোবিন্দ বলল : না।

না কেন ?

বাঁচা-মরা তার নিজের হাতে। নেশায় মেয়েটা বুঁদ হয়ে আছে, তাকে জীবনের পথটা বাৎলে দেব।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম : কারণবাবা ?

গোবিন্দও উত্তর দিতে দেরি করলনা। বলল : তাঁর সঙ্গে আমার অন্য খেলা—ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ।

তুমি তাকে সৎসঙ্গ বল ?

কোন্‌টা সৎ আর কোন্‌টা অসৎ, দূর থেকে তা জানা যায়না। অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে তা জানতে হয়।

গোবিন্দ থামলনা, বলল : আর একদিন তুমি এই কথা জানতে চেয়েছিলে। তন্ত্রমন্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কথা। এখনও কি জানবার ইচ্ছে আছে ?

কেন থাকবেনা ?

গোবিন্দ বলল : বেশ, একদিন তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাব। তাঁর মুখেই সব শুনতে পাবে।

তাঁর মুখে কেন : আমি শশব্যস্তে উত্তর দিলুম : তুমিই আমাকে ব'লো।

ভয় !

গোবিন্দ হাসল।

এ কথায় আমার পৌরুষে আঘাত লাগে। বললুম : তাই হবে।

সাত

ইতিমধ্যে গোবিন্দ তার জপ-তপ পূজাপার্বণের সামগ্রী বার করে ফেলেছে। খেতে বসবার আগে পূজায় বসল। কিন্তু পূজার কোন উপকরণ নেই। কোশাকুশি ফুলচন্দন ভোগ নৈবেদ্য কিছুই নেই। ঠাকুর পর্যন্ত না। গোবিন্দ একদিন বলেছিল যে এসবের কোনই দরকার নেই। তন্ত্রে দুরকম পূজারই বিহিত আছে—বহির্যাগ ও অন্তর্যাগ। পূজার উপকরণ থাকলে বহির্যাগে ব'সো, না থাকলে মানসোপচার—

> পৃথিব্যাত্মক গন্ধঃ স্যাদাকাশাত্মক পুষ্পপং।
> ধূপোবায়্বাত্মকঃ প্রোক্তা দীপো বহ্ন্যাত্মকঃ পরঃ॥
> রসাত্মকঞ্চ নৈবেদ্যং পূজাপঞ্চো শচারিকা॥

গুরুগীতার নির্দেশ এই যে পৃথিবীকে গন্ধ, আকাশকে পুষ্প, বায়ুকে ধূপ, তেজকে দীপ ও জলকে রসাত্মক নৈবেদ্য কল্পনা করে এই পঞ্চোপচারে অন্তর্যাগ করা চলে। ষট্‌চক্রভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ছয় গ্রন্থিতে পদ্মাকারে ছয়টি চক্র সংলগ্ন আছে। শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে এই সব গ্রন্থি ও পদ্মের কয়টি করে দল, তার হিসেব আমার মনে নেই। কুলার্ণব তন্ত্রে নাকি পূজা-পদ্ধতি লেখা আছে। দেহের বায়ুযোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করতে হবে। তারপর বীজমন্ত্রের উচ্চারণে তাঁকে জাগ্রত করে ছয় পদ্মকে এবং পদ্মস্থিত তিন শিবকে ভেদ করবে। তারপর সেই কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে স্থাপন করে পরম শিবের সঙ্গে সংযোগ করাবে। এর থেকে উৎপন্ন হবে পরমামৃত। সাধক তাই আকণ্ঠ পান করে কুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মে আনবে কুলপদ্ম দিয়ে।

গোবিন্দ বোধহয় এই কাজে বসেছে। কতক্ষণ ধ্যানস্থ থাকবে জানিনে। উপায়ান্তর না দেখে আমি দাবা পেতে বসলুম। দাবাখেলা যোগাভ্যাসের মতো। এ যোগ দেহের নয়, ইন্দ্রিয়েরও নয়। এ যোগ বুদ্ধির। দেহ মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি সব কিছুকে ঐ সাদা-কালো ছকখানির উপর সংহত করে পরম ধৈর্যের চরম যোগাভ্যাস করতে হবে। মাছ ধরাকে তপস্যা বলা চলে। উর্ধ্ববাহু শিবনেত্র নয়, দু হাতে ছিপ ধরে ফাৎনার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে নির্বিকার প্রহর গণনা। কলিযুগের এই তো তপস্যা।

বাহিরে অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে। সোহনদের আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা। কেমন থমথম করছে চারিদিক। ঘরের ভিতরে তাকিয়েও কোন জীবনের সাড়া পেলুম না।

মুদ্রিত নেত্রে গোবিন্দ তন্ময় হয়ে আছে।

হঠাৎ আমার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা হল। এই কি জীবন! আত্মীয়-পরিজন-হীন নির্বান্ধব দেশে এ আমরা কেমন করে দিন কাটাচ্ছি! জীবনের আস্বাদ কি আমরা ভুলে গেলুম, না তার অর্থ আমরা হারিয়ে ফেলেছি! মানুষ কি শুধু কাজ নিয়ে বাঁচতে পারে! শুধু কর্তব্যবোধ আর চাপানো দায়িত্ব নিয়ে! রক্তে কি তার স্বাধীনতার স্বপ্ন নেই!

ভাবতে ভাবতেই পাগলামি এল। ডাকলুম: গোবিন্দ!

গোবিন্দ সাড়া দিলনা।

দৃঢ়স্বরে আবার ডাকলুম: গোবিন্দ!

গোবিন্দ বোধহয় এমন কঠিন কণ্ঠস্বর আমার অনেকদিন শোনেনি। তার ধ্যানভঙ্গ হল। কথা না বলে আমার দিকে তাকাল প্রশ্নের দৃষ্টিতে। বললুম: অনেক হয়েছে, এবারে উঠে পড়।

গোবিন্দ এই আদেশের অর্থ বুঝতে পারলনা। কোনও প্রশ্নও করলনা। শুধু মাথাটা একটু উপরের দিকে তুলে বুঝিয়ে দিল, কেন।

বললুম: ঢের হয়েছে। এমন করে আর তোমাকে ঠকতে দেবনা।

মনে মনে গোবিন্দ বোধহয় হাসল। তাই চোখ বন্ধ করে আবার মন দিল নিজের কাজে।

দাবার ছক আমি গুটিয়ে রাখলুম। নিজেদের জীবনের ছকে একটা বোড়েও আমার এগোয়নি। যুদ্ধে যেদিন নেমেছিলুম, সেদিন আমার পুরো সেনাদল সঙ্গে ছিল। আজও আছে, কিন্তু ঠিক একই জায়গায়। হুকুমের অভাবে এক পাও তারা এগোয়নি। গোবিন্দর কিছু এগিয়েছে। কিন্তু সে নিতান্ত বেয়াড়া ভাবে। পরিকল্পনার অভাবে দুর্গকে সে অরক্ষিত করে ফেলেছে। এখন শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা। তাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। বললুম: উঠবেনা?

এবারে আর গোবিন্দর ভাবান্তর দেখলুম না।

দাঁতে দাঁত চেপে বললুম: তোমার কুলকুণ্ডলিনীর নিকুচি করেছি!

জানিনা কেন নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। উঠে গিয়ে গোবিন্দর হাত টেনে ধরলুম, বললুম: ওঠ শিগ্‌গির।

গোবিন্দর উপায় ছিলনা। দাঁড়াতেই হল। বলল: হঠাৎ এমন পাগল হলে কেন?

আমি পাগলামি করছি, না তুমি পাগল হয়ে গেছ!

গোবিন্দ হেসে বলল: আমি তো চিরকালের পাগল।

সেকি! মনে হল, আমি একটা ধাক্কা খেয়ে গেলুম। যে সত্যি পাগল, সে তো নিজেকে পাগল ভাবেনা। গোবিন্দ যখন পাগল বলে স্বীকার করছে, তখন তাকে আর পাগল ভাবা উচিত হবেনা। বরং আমিই নিজেকে সুস্থ ভাবি। তবে কি—

আর আমি ভাবতে পারলুম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: তবে কি আমি পাগল?

গোবিন্দ এবারেও হাসল।

আমি ক্ষেপে গেলুম, বললুম : হাসলে চলবেনা গোবিন্দ। জীবন নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করছ। সে কথা মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে।

খেলা বল, ছেলেখেলা ব'লোনা।

গোবিন্দ উত্তর দিল তরল সুরে।

খেলা করবারই বা তোমার কী অধিকার আছে?

নেই অধিকার?

কিছুতেই নেই।

গোবিন্দ হেসে বলল : জীবন আমার, আর অধিকার থাকবে কি তোমার পেমার দিদির?

তর্কের খাতিরে বললুম : নিশ্চয়ই আছে। তোমার জীবনের ওপর তো তোমার একার অধিকার থাকবেনা যে ইচ্ছে করলেই তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে! শুধু তোমার পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের নয়—আমার আছে, সোমারও আছে।

সোমারও আছে!

গোবিন্দ হাসল হা-হা করে।

বললুম : আমাদের এ অধিকার অস্বীকার করলে তোমাকে অমানুষ বলব।

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলল : সোমার ওপরেও তাহলে আমাদের অধিকার আছে বল।

আমি বলে ফেলছিলুম আছে বৈকি। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিলুম। এমন প্রগল্‌ভ হবার বয়স আমি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। আমি চুপ করে গেলুম।

গোবিন্দ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপরে কাছে এসে চেয়ার টেনে বসল। আমি জানতুম সে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে, কিন্তু আমি কিছু শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলুম না।

গোবিন্দই কথা কইল, বলল: সোমাকে ভাল লেগেছে বুঝি?

আমি চমকে উঠলুম। বললুম: মানে?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন মনে এল?

মন তো বিচিত্র জিনিস!

বিচিত্র বলে কি এমনি বেয়াড়া? এমন অসঙ্গত কথা কেন মনে আসবে?

অসঙ্গত কেন বলছ? এই তো সবচেয়ে সঙ্গত কথা। এই পাহাড়ের কোলে নদীটি কেমন মানিয়েছে বল! সোমাও কি আমাদের মনে তেমনি মানায়নি?

এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। ঘর ছেড়ে তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে এলুম।

গোবিন্দও আমার পিছনে এল।

ঝিঁঝি ডাকছে। তার একটানা আওয়াজ। নিস্তব্ধ পৃথিবীর সে একটা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি। ঐ ধ্বনি পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করেনা। মনে হল, আমাদের মনেও অমনি একটি ধ্বনি বাজছে। জীবনের ধ্বনি। ওটা থামলেই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কেন থামল, কেন তাল কাটল! কোন অমঙ্গল কি আছে ভবিষ্যতের ভিতর লুকিয়ে! আশঙ্কায় বুক কাঁপে।

আট

প্রথম সন্ধ্যার কথা আমরা ভুলে গেছি। অলৌকিক ভেবে সেদিন যাতে বিচলিত হয়েছিলুম, মতিভ্রম বলে এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। এমন অনেক ঘটনা জগতে হামেশা ঘটে, বিজ্ঞানে যার নাগাল মেলেনা। বিজ্ঞান তো সৃষ্টির আদি নয়, সৃষ্টিকে বিজ্ঞান অনুসরণ করে। ভাষায় যেমন ব্যাকরণ।

গোবিন্দ রেডিও খুলে গান শুনছিল, আর গান গাইছিল গুনগুন করে। মন-মেজাজ যে প্রসন্ন আছে, তাতে সন্দেহ জাগেনা। আমি জানি, সে আমার অপেক্ষাতেই আছে। নক্সাপত্র গোটালেই সে দাবা বিছিয়ে বসবে। খানিকক্ষণ আগে তাড়াও দিয়েছে। আমি তাকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছি।

হঠাৎ সে উঠে এল। নক্সার একটা কোণা ধরে টেনে সরিয়ে দিল। বলল : আর অপেক্ষা করতে পারবনা।

হেসে বললুম : চাকরিটা যাবে।

দাবার ছক বেছাবার সময় গোবিন্দ প্রশ্ন করল : কেন ?

নক্সাখানা মুড়ে আমি টিনের খোলের ভিতর পুরে ফেললুম। বললুম : উত্তরে কারণবাবা আর দক্ষিণে শ্মশান। চোখ বন্ধ করলেই সোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

গোবিন্দ অট্টহাস্য করে উঠল।

দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে গোবিন্দ বলল : তুমিই প্রথম চাল দাও।

শেষ চালটা কি তুমি দেবে ?

হাসতে হাসতেই গোবিন্দ উত্তর দিল : ইচ্ছে তো সেই রকম।

আমিও হেসে বললুম : আমাকে মাৎ করে কি তোমার আশ মিটবে?

গোবিন্দ এ কথার উত্তর দিলনা। বলল : সেদিন তুমি একটা কথা লুকিয়েছিলে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : তোমার কাছে গোপন করেছি!

গোবিন্দ বলল : হ্যাঁ। যেদিন আমরা প্রথম এসেছিলুম, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তোমরা কিছু দেখতে পেয়েছিলে। আমাকে বলেছিলে, কিছু না।

আমি তখন গম্ভীর ভাবে ভাবছিলুম, কোন্ বোড়েটা চালব। বললুম : একটা ছায়া।

ছায়া : গোবিন্দ আশ্চর্য হল, বলল : দাঁড়িয়ে শুধু দেখলে! ছুটলেনা তার পেছনে?

বললুম : তুমি কবি মানুষ। ছায়ার পেছনে ছুটতে হয়, তুমি ছুটো।

তার কবিত্বের পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি। প্রয়োজনমতো সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে পারে যথেচ্ছ ভাবে। নিজেও মানে বোঝে, আমাকেও বোঝায়। কিন্তু গোবিন্দ আজ প্রতিবাদ করলনা, বলল : তুমি শুধু ছায়াই দেখলে। তার আগে বা পেছনে আর কিছু দেখলেনা?

তা দেখলে আর ভাবনা কী ছিল!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বলল : তা বটে।

বাহিরে হাওয়া বইছে জোরে জোরে। সেই হাওয়া তাঁবুর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। পৎ পৎ করে শব্দ হচ্ছে, আর কেঁপে উঠছে ভিতরের আলো। মনে হল, গোবিন্দ তার কান পেতে বাহিরের শব্দ শুনছে। আমিও সেই শব্দ শোনবার চেষ্টা করলুম!

একসময় গোবিন্দ বলল : কিছু শুনতে পাচ্ছ কি?

বললুম : বাতাসের শব্দ।

আর কিছু?

মাথা নেড়ে বললুম : না।

না!

গোবিন্দ বড় আশ্চর্য হল।

আমিও হলুম। তারপর আরও ভাল করে কান পেতে বললুম: পাতার শব্দ।

বড় মৃদু মর্মরধ্বনি। কিংবা শাড়ির আঁচল টানার মতো খসখস শব্দ। গোবিন্দ খুশী হল অপরিমিত। বলল: ঠিক সেইরকম শব্দ, না?

সেইরকম মানে?

সেদিন যেমন শুনেছিলে?

বললুম: না। সে আরও স্পষ্ট, আরও বেগবান। মনে হয়েছিল, কে যেন শুকনো পাতা নিষ্ঠুর পায়ে মাড়িয়ে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে। সবই শুনেছি। দেখেছিও অনেক। শুধু মানুষটিকে দেখতে পাইনি।

গোবিন্দ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল: হুঁ।

রাত আরও গভীর হল। কিন্তু চাঁদ উঠল না। আজ বোধহয় শেষরাতে চাঁদ উঠবে। খেয়ে দেয়ে গোবিন্দ গিয়ে বাহিরে বসেছিল। শুতে আসছিল না। বললুম: কী হল, শোবে না আজ?

গোবিন্দ চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে বলল: তুমি শুয়ে পড়।

বললুম: এমন তন্ময় হয়ে কী ভাবছ? বাড়ির কথা, না আর কিছু?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

বললুম: তবে কি সেদিনের কথা ভাবছ?

ভূতো আমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখটা আমার গায়ে ঘষতে ঘষতে লেজ নাড়তে লাগল। মানে, এইবার ঠিক ধরেছ ওর মনের কথা।

নিঃশব্দে গোবিন্দ আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ ঠিক ধরেছি তো?

গোবিন্দ এ কথারও উত্তর দিলনা।

এবারে আমি তার হাত ধরে ভিতরে টেনে আনলুম। বললুম ঃ তোমার কিসের ভাবনা বল তো? এই পাহাড়ে বনে এমন অনেক ঘটনাই তো ঘটে, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। তার জন্যে রাত জাগতে হবে!

রাত জাগতে হলনা। কিন্তু শেষরাতে আবার ঘুম ভাঙল। ভূতো হঠাৎ ডাকতে শুরু করেছে। নদীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। সেদিনের মতো কুকুরটা আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে। লাফাচ্ছে দুরন্ত আক্রোশে। তার গলার শিকলের শব্দে মুখর হয়েছে চারিদিক।

হঠাৎ আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, গোবিন্দ ছুটে বেরিয়ে গেল। টর্চ ছিল টেবিলের উপরে। সেটাও নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করলনা। আমিও তার অনুসরণ করলুম, কিন্তু বাহিরে এসে তাকে দেখতে পেলুমনা।

আকাশে বোধহয় একখণ্ড চাঁদ ছিল। ঘন বনের আড়ালে সে চাঁদ হারিয়ে গেছে। শুধু একটু নেশার মতো আবছায়া আলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সেই আলোতে পৃথিবীটা আমি দেখবার চেষ্টা করলুম।

ভূতো তখনও ডাকছে, লাফাচ্ছে দক্ষিণের দিকে মুখ করে। আমিও আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই ছায়া-মূর্তির আবির্ভাবের অপেক্ষায় রইলুম।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত! তারপরে কী যে হয়ে গেল টের পেলুমনা। ভূতো নেতিয়ে পড়েছিল, একেবারে নিঃসাড় নিস্তব্ধ একটা দমকা

বাতাস বয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। ধুলো উড়লনা। তবু কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু একটা ছায়া দেখলুম। আর শুনলুম যক্ষের নিঃশ্বাসের মতো শুকনো পাতার শব্দ।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কতক্ষণ কেটেছিল জানিনে। চেতনা ফিরে পেলুম ভূতোর আদরে। একেবারে আমার গায়ের কাছে এসে হাঁটুর উপর মুখ ঘষছে। সাহস দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু গোবিন্দকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

পূর্বের আকাশ স্বচ্ছ হতে এখনও কি খুব দেরি আছে!

নয়

গোবিন্দ কোথায় গেল !

লোকটা যে একটু স্বতন্ত্র জাতের তাতে সন্দেহ নেই। খুব দরকারী কাজে তার অবহেলা দেখেছি। আবার প্রচুর উৎসাহ দেখেছি একেবারে অকাজে। সময়ের হিসাব রাখেনা, সময় মেনেও চলেনা। বলে, আমি কেন ঘড়ির হুকুম মানব। সময়ের কথা মনে করিয়ে দিলে বিরক্ত হয়। বলে, তোমার ঘড়ি আমি বন্ধ করে দেব। সুস্থ থাকলে সরকারী কাজ করে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। তখন হেসে বলে, দেখেছ ঘড়িটাকে, কেমন পেছু লেগেছে।

রুচির ব্যাপারেও তাই। আজ যা পছন্দ হল, কাল তা হয়না। সে কথা মনে করিয়ে দিলে বলে, ও হল মর্জির ব্যাপার, মেজাজের উপর নির্ভর। কাজেই তার যুক্তি অকাট্য।

তাঁবুর ভিতর ফিরে এসে শুতে পারলুম না। অন্ধকারে লোকটা গেল কোথায় ! ছায়ামূর্তি তো অনেকক্ষণ আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। গোবিন্দ কেন ফিরছেনা ! কোন বিপদে পড়েনি তো ! এই ঘন অরণ্যের ভিতর কে তাকে উদ্ধার করবে ! চীর গাছের শুকনো পাতা খসখস করছে, আর শোঁ শোঁ করছে ঝাউ-এর পাতা। দূর থেকে কালী নদীর কলধ্বনি ভেসে আসছে। ঝিঁঝিরা ডাকছেনা !

টেবিলের উপর থেকে টর্চটা সংগ্রহ করে নিলুম। বন্দুকটা নিলুম বিছানার তলা থেকে। পরিধেয় পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ হলনা। চটি পায়েই বেরিয়ে পড়লুম।

একবার মনে হল রাম সিং-কে ডেকে তুলি। গাড়োয়ালের লোক

রাম সিং। তার দুর্বার সাহস। বনকে শহর ভাবে, আর পাহাড়কে সমতল। পথ চলে চোখ বুঁজে। রাত জাগে কুকুরের মতো। কিন্তু সে লোকটাও মনে হল ঘুমে আজ অচৈতন্য। তার তাঁবুর ভিতর থেকে কোন সাড়া এলনা।

ভূতো ছটফট করছিল। সে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। গলার শিকল খুলে দিয়ে বললুম : আয়।

প্রবল উদ্যমে ভূতো লেজ নাড়ছিল। এবারে লাফিয়ে এগিয়ে গেল।

বললুম : ব্যাপারটা কি রে ?

মুখ তুলে ভূতো ঘেউ ঘেউ করল। মানে, আমি সঙ্গে আছি। ব্যাপার যাই হোক, ভয় পাবার কিছু নেই।

বললুম : তবে নেতিয়ে পড়েছিলি কেন ?

ভূতো বলল, গরর-গরর। মানে, কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

তবে এখন কিসের ভরসা দিচ্ছিস ?

মুখ তুলে ভূতো ঘেউ ঘেউ করল। মানে, ঘুমের ঘোর তো আর নেই। এখন তৈরি হয়ে বেরিয়েছি।

বললুম : সাবাস।

ভূতো অমনি পিছিয়ে এসে আমার গায়ে মুখটা ঘষে দিল। আমার কাঁধে বন্দুক, ডান হাতে টর্চ। বাঁ হাতে তার গালে দুটো চড় মারলুম আস্তে আস্তে। হাতের ভিতর তার মুখটা ঘষে দিয়ে ভূতো আবার এগিয়ে গেল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বার করল, হিস্ হিস্।

পথ আমি নিজে চলছিলুম না। ভূতো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সামনের দিকে নেমে যাচ্ছিলুম। একটু এগিয়েই নদীর তীর পাওয়া গেল। রাতের অন্ধকারেও রূপালী জলের রেখা দেখতে পেলুম ছলছল করে বয়ে চলেছে।

ভূতো মাটি শুঁকল। বললুম : কী দেখেছিস রে ?

ভূতো একবার ডানদিকে, আর একবার বাঁ দিকে ফিরল। মানে, কোন পথে গেছে।

সে কথা তোর মাটি শুঁকে বার করতে হয় ?

ভূতো কী বুঝল সেই জানে। এবারে একই ভঙ্গি করল ছুবার। বললুম : ছুজন লোক ?

মস্ত বড় জিব বার করে ভূতো হাসল।

আমি আশ্চর্য হলুম : ছুজন কে রে ?

কাছে একখণ্ড বড় পাথর ছিল। ভূতো লাফিয়ে গিয়ে সেই পাথরে বসল সামনের পা ছুটো পিছনের পায়ের হাঁটুতে রেখে। এই ভঙ্গি দেখেই আমার রাম সিং-এর কথা মনে পড়ল। হাতে কাজ না থাকলে সে বাহিরে বসে এমনি করে, হাত দিয়ে নিজের হাঁটুটা জড়িয়ে।

খুশী হয়ে বললুম : সাবাস বেটা, রাম সিং-এর কথা বলছিস তো।

ভূতো লাফিয়ে এসে আমার গায়ে তার মুখটা ঘষে দিল। বাঁ হাতে আবার তার গালে ছুটো চড় মারলুম আস্তে আস্তে। হাতের ভিতর তার মুখটা ঘষে দিয়ে ভূতো হিস হিস আওয়াজ করল দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

মানে, সেও খুশী হয়েছে।

ভূতো তার কর্তব্যের কথা ভোলেনি। দক্ষিণ দিকে খানিকটা পথ গিয়েই ফিরে এল। এবারে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল উত্তর দিকে। তাকে অনুসরণ করতে করতে বললুম : কি রে ছুজনেই একদিকে গেছে বুঝি ?

ভূতো উত্তর দিল না। আরও জোরে এগিয়ে চলল।

বললুম : অত দৌড়সনা। এই পাথুরে রাস্তায় আমি ছুটতে পারব না। অন্ধকারে পড়ে গেলে হাড় গোড় গুঁড়িয়ে যাবে।

ভূতো একবার পিছন ফিরে তাকাল। তারপর ফিরে এসে আবার আমার সঙ্গে চলতে লাগল।

মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য লাগে। এক দেশের মানুষ আর এক দেশের কথা বোঝেনা। ভারতবর্ষের এক রাজ্যের লোক বোঝেনা আর এক রাজ্যের কথা। কিন্তু এই জানোয়ারটা বুঝি মানুষের কথা বোঝে। না বুঝলে, এমন করে উত্তর দেয় কেমন করে? হয়তো এ তার অনুমান, কিংবা অভ্যাস। হয়তো বা কিছুই নয়। তার খামখেয়ালি আচরণের আমি মনগড়া উত্তর করে নিচ্ছি।

ডান হাতে কালী নদী কলকল ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে। জলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে অন্ধকার আসছে ফিকে হয়ে। রাত্রি শেষ হতে আর দেরি নেই। কিন্তু পথের দিকে তাকিয়ে কোন ভরসা পাচ্ছি না। টর্চের আলো ফেলে যতদূর দেখা যায়, সেই সীমার মধ্যে কারও সন্ধান নেই। গোবিন্দ তবে কোথায় গেল!

আর রাম সিং! রাম সিং-এর কথায় আমার অন্য কথা মনে এল। তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে তার কথা আমার মনে পড়েছিল। ভেবেছিলুম, সে বোধহয় তার নিজের তাঁবুর ভিতর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। সারাদিন তারা নানা কাজকর্ম করে। রাতে ভাল ঘুম হওয়াই স্বাভাবিক। আমি শুধু ভূতোর আচরণেই ভাবছি, রাম সিং বেরিয়ে এসেছে। গোবিন্দকেই খুঁজতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল, বনের ভিতর কার পদশব্দ শুনতে পেলুম। পথের উপর টর্চের আলো ফেলে কিছু দেখতে পেলুম না। মাটি শুঁকে ভূতো ডানহাতে মোড় ফিরেছিল। এইবারে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। সেইদিকে আলো ফেলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

দূরের একটা গাছের আড়ালে মনে হল, মানুষ দেখতে পাচ্ছি। আচম্বিতে আমার হাত গেল বন্দুকের উপর। আর ভূতো ডাকতে লাগল প্রাণপণে।

ভেবেছিলুম, বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করব। কিন্তু তার দরকার হলনা। তার আগেই আমি রাম সিং-এর গলা শুনতে পেলুম। হাঁক দিল: ভূতো!

ভূতো আর একবারও ডাকল না, একেবারে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও তার পিছনে ছুটে গেলুম।

বেশি দূর নয়। সেখানে পৌঁছতে আমাদের একটুও সময় লাগলনা। রাম সিং-ও এগিয়ে আসছিল। তার কাঁধের উপর গোবিন্দকে অচৈতন্য দেখলুম। আশ্চর্য হয়ে বললুম: একি!

রাম সিং হিন্দীতে কথা বলে। বলল: বাবুজীর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

জিজ্ঞাসা করলুম: কেন বল তো?

তা না হলে কেউ অন্ধকারে ছোটে: রাম সিং হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দিল: আমি তাঁকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলুম।

আর কিছু দেখনি?

রাম সিং বলল: আর কী দেখব! অন্ধকার রাত, ভুতো ডাকছিল ঘেউ ঘেউ করে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাবুজী ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর?

রাম সিং বলল: আমিও ছুটলুম। কিন্তু নদীর ধারে এসে পথ হারিয়ে গেল। বাবুজী কোন্ ধারে গেলেন, দেখতে পেলুম না। খুঁজে খুঁজে এই বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেলুম।

গোবিন্দর নাকের কাছে হাত এনে দেখলুম, তার প্রাণ আছে, চেতনা নেই। নদীর ধারে পৌঁছে তাকে মাটির উপর শোয়ানো হল।

রাম সিং এবারে অঞ্জলি ভরে জল এনে গোবিন্দর মুখে চোখে ছেটাতে লাগল।

আমি আমার হাত নেড়ে একটু হাওয়া দেবার চেষ্টা করে বললুম: কেন বেরিয়ে গিয়েছিল বলতে পারনা?

কুকুরটা খুব ডাকছিল: রাম সিং উত্তর দিল।

আরও কিছু জানতে পারা যাবে এই আশায় বললুম: আর কিছু?

আর তো কিছু দেখিনি। বড় বাতিটা জ্বলছিল। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।

তুমি একা বেরিয়েছিলে; না আরও কেউ বেরিয়েছিল?

দুএকজন আমাকেই জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাপার কী? আমি তাড়া দিয়ে তাদের ঘুমতে বলেছিলুম।

তারপর?

হঠাৎ মনে হল, আপনাদের তাঁবু থেকে কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। আলোর নিচে দিয়ে যাবার সময় বাবুজীকে আমি চিনলুম।

গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম: চুপ!

রাম সিং জল ছেটানো বন্ধ করে আগেই চুপ করেছিল। মনে হল, তার জ্ঞান ফিরে আসছে। কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরেই গোবিন্দ চোখ মেলে চাইল।

আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে ছিলুম। কিন্তু গোবিন্দ কথা কইল, আস্তে আস্তে বলল: আমরা কোথায়?

রাম সিং আমার মুখের দিকে চাইল। আমি উত্তর দিলুম: নদীর ধারে।

গোবিন্দ তার চারিদিকটা একবার চেয়ে দেখল। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। পথের সঙ্গে বনের এবং গাছের সঙ্গে আকাশের প্রভেদটা বোঝা যাচ্ছে। বলল: এখানে কেন এলুম?

বাধা দিয়ে বললুম ঃ সে কথা পরে হবে।

গোবিন্দ তার নিজের শরীরটা দেখবার চেষ্টা করল। হাত দুখানাও তোলবার চেষ্ট করল। তারপর বলল ঃ সে কোথায় গেল?

আমি আশ্চর্য হলুম অপরিমিত। কিন্তু সে ভাব যথাসম্ভব গোপন করে বললুম ঃ কার কথা জিজ্ঞেস করছ?

গেবিন্দ উত্তর দিলনা।

বললুম ঃ বল।

গোবিন্দ নিরুত্তর।

অনেকক্ষণ পরে বলল ঃ চল এবারে ফিরে যাই।

বললুম ঃ চল।

গোবিন্দ আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে ক্যাম্পে ফিরল।

পূবের আকাশে তখন অন্ধকার নেই।

দশ

গোবিন্দকে আজ কাজে যেতে আমি বারণ করেছিলুম। মনে করেছিলুম, তার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে তা স্বীকার করলনা। ভাল করে স্নান করে কাপড় জামা পরল, মহতোকে ডেকে বলল : ডবল নাস্তা।

ডবল নাস্তা মানে ভারি রকমের প্রাতরাশ। হেভি ব্রেক্‌ফাস্ট। আজকাল শহর এলাকায় হাই টি-এর প্রচলন দেখে এসেছি। শুধু টি নয়, হাই টি। মানে, সন্ধ্যেবেলায় এত রকমের ভোজ্য বস্তু থাকবে যে, বিকেলের চা-টা বাঁচবেনা, বাঁচবে রাতের খাবার। আমাদের ডবল নাস্তাও কতকটা তেমনি। সকাল আটটায় যখন কাজে বেরই, তখন ফেরার সময় ঠিক থাকেনা। চেষ্টা করি দুটোর মধ্যে ফিরতে, কিন্তু সব সময় হয়ে ওঠেনা। তাইতেই ডবল নাস্তার প্রয়োজন। সারাদিন কাজ করে ফিরে আসবার মতো কিছু শক্তি সঞ্চিত থাকবে। গোবিন্দর কথার উত্তরে বললুম : আজ কি না গেলেই হতনা ?

রুক্ষস্বরে সে উত্তর দিল : ওপরওয়ালা নেই বলেই ফাঁকি দিতে হবে, এ কথায় আমি বিশ্বাস করিনা।

বললুম : আমি তোমার কাজ করে দেব।

গোবিন্দ বলল : তাহলে তো আমি ফিরে গেলেই পারি।

বললুম : এ রাগের কথা নয় ভাই, আমার অনুরোধ না হয় একটা দিন রাখলে ?

এ তোমার বেয়াড়া অনুরোধ। সুস্থ শরীরে কেন আমায় ঘরে বসিয়ে রাখবে ?

তোমার সুস্থ শরীর, এ কথা যে মানতে পাচ্ছিনে। পারলে আপত্তি করতুম না।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ খালাসিদের হাঁক দিল। বলল ঃ আজ বড় দূরবীন সঙ্গে নেবে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ছেলেবেলায় নিশিতে ডাকার কথা শুনেছিলুম। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিনি। তারপর ইংরেজীতে একটা গল্প পড়ে সেই ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হয়েছিল। এ রোগের ডাক্তারী নাম সম্‌নাম্বুলিজ্‌ম্‌। মানুষ ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে ওঠে। জাগ্রত মানুষের মতো দরজা খোলে, পথ চলে। অপ্রশস্ত আলসের উপরেও নাকি হাঁটতে পারে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করার গল্পও শুনেছি। বাধা পেয়ে পড়ে গেলে আর উঠতে পারেনা, গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যায়। আমি ডাক্তারি জানিনা। এর বৈজ্ঞানিক সত্যের খবরও রাখিনা। শোনা গল্প, সহজ ভাবে বিশ্বাস করেছি। আজ আবার এই গল্প আমার মনে পড়ল।

গোবিন্দর জন্য মহতো ডবল নাস্তা এনেছিল। টেবিলের উপর সেটা রেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনারটাও আনব হুজুর ?

বললুম ঃ আমার নাস্তা হলেই চলবে, ডবল নাস্তার দরকার নেই।

মহতো খাবার আনতে গেল।

আমি জানি, গোবিন্দর কোন রোগ নেই। কর্মজীবনে অনেকদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা হয়েছে অনেকবার। চেষ্টাচরিত্র সুপারিশ করে একত্র থেকেছি। যাযাবর জীবন বড় দুঃসহ লাগে, বড় অসহায় মনে হয়। তাই একটা মনের মতো সঙ্গী চাই। গোবিন্দ আমার প্রিয় সঙ্গী।

এই পরিকল্পনাতেও ছোট ছোট দল বেরবার কথা ছিল। চার পাঁচটি খালাসি নিয়ে এক একজন ওভারসীয়ার। আমরা সবাই

আপত্তি জানিয়েছিলুম। এ তো সমতলের কাজ নয় যে একটা বড় ক্যাম্প পড়বে। আর আমরা এক একজন এক একদিকে গিয়ে কাজ সেরে আবার ফিরে আসব। পাহাড়ে নদীর জরিপ এমন সহজ কাজ নয়। সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। মাইলের পর মাইল কাজ করতে হবে। দিনের পর দিন সময় লাগবে। এক একটা ক্যাম্পেই হয়তো দশ পনরো দিন করে থাকতে হবে। তাই আমরা দুজন করে ওভারসীয়ার এসেছি দশজন খালাসি নিয়ে। ক্যাম্পের ভার রাম সিং আর মহতোর উপরে। রাম সিং ভাল পাহারা দেয়, আর মহতোর রান্নার হাতের প্রশংসা আছে। বাকি আটজন খালাসির কাজ করে। দুভাগে দুজনের সঙ্গে বেরয়। জরিপের সাজসরঞ্জাম তো কম নয়। থিওডোলাইট, লেভেলিং ইনস্ট্রুমেণ্ট, তার গজ স্ট্যাণ্ড চেন ফিতা। চারটে লোক সঙ্গে না থাকলে চলেনা।

আমার খালাসিরাও তৈরি হয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল, যন্ত্র কী নেবে। গোবিন্দ আজ থিওডোলাইট নিয়ে যাচ্ছে। আমার দরকার ছিল লেভেলিং ইনস্ট্রুমেণ্টের। বললুম ঃ ছোট দূরবীন নাও।

গোবিন্দ আজ খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। অন্যদিন কথা বলে খায়। আজ একটাও কথা কইলনা।

গোবিন্দর যে কোন রোগ নেই, এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। এ যদি নিশিতে ডাকা হত, তাহলে ভূতো এমন করে ডাকত না, আমাদেরও ঘুম ভাঙত না। বাকিটুকু যা দেখেছি, সে আমার চোখের ভুল হতে পারে। স্বপ্নও হতে পারে। তবে গোবিন্দ যে আমাদের চেয়েও কিছু বেশি দেখেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আরও বেশি না দেখলে সে অমন করে ছুটে যেতনা। কিন্তু কী দেখল সে!

আমি জানি, গোবিন্দ এ কথার উত্তর এখন দেবেনা। সহজেও দেবেনা। যদি কখনও দেয়, নিজের মর্জি মতো দেবে। প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাবেনা, অনুরোধ করে শুধু আঘাত পেতে হবে। কিন্তু

যখন বলতে চাইবে, তখন শুনতে না চাইলেও বলবে। এমন ঘনিয়ে এমন ফাঁপিয়ে বলবে যে ধৈর্য হারাতে হবে। অথচ বিরক্ত হলে চলবেনা। তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধবে। গোবিন্দর এই প্রকৃতি।

আমার খাবার যখন এল, গোবিন্দর খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে। ড্রয়িং টেবিল থেকে এটা সেটা টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে বলল: চললুম।

বললুম: কোন্ দিকে যাচ্ছ?

বেরিয়ে যেতে যেতে গোবিন্দ বলল: উত্তরে।

উত্তরে কেন? কাল তো দক্ষিণে গিয়েছিলে!

বাহির থেকে গোবিন্দর উত্তর এল: মর্জি।

তার মর্জির উপর আমার কোন হাত নেই। তাই চুপ করে গেলুম।

খেতে খেতে রাম সিং-কে আমি ডাকলুম। লোকটা কথা কম বলে। প্রয়োজনের চেয়েও কম। তার জন্য রীতিমতো অসুবিধাই হয়। কিন্তু আজ শেষরাতে তাকে প্রগল্ভ হতে দেখেছি। সেও তখন সুস্থ ছিলনা। তাই অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলেছে। এবারে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে কাছে এসে দাঁড়াল।

বললুম: আর কোন খবর পেলে?

রাম সিং উত্তর দিলনা।

বললুম: আমি গোবিন্দর কথা জিজ্ঞেস করছি।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে রাম সিং বলল: কাছে একটা খারাপ জায়গা আছে।

খারাপ জায়গা?

রাম সিং আর কথা কইলনা।

একটা ধমক দিয়ে বললুম: বল না, কী খারাপ জায়গা।

রাম সিং সংক্ষেপে বলল: শ্মশান।

আমি হেসে ফেললুম। বললুম: শ্মশান আবার খারাপ জায়গা হল কবে থেকে? রাজা উজীর থেকে গরীব ভিখিরীকে পর্যন্ত যে জায়গায় যেতেই হবে, সে আবার খারাপ কিসের!

রাম সিং উত্তর দিলনা।

সোহন এসেছিল আমার জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। সে বলল: খুব খারাপ শ্মশান, হুজুর। এ তল্লাটের লোক ভয় পায়।

হেসে বললুম: মেলা ভূত আছে বুঝি?

কিন্তু আমার রসিকতায় কারও মুখে হাসি ফুটলনা। বুঝতে পারলুম যে ইতিমধ্যেই তারা নানা সংবাদ সংগ্রহ করে ফেলেছে। হয়তো কালকেই করেছিল। আজ সেইসব কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছে। তাই আর হাসতে কারও সাহস হলনা।

এদের ভয় দেখে আমি বিস্মিত হই। বিংশ শতাব্দী শেষের দিকে এগিয়েছে। মানুষ আর পৃথিবীতে বেড়িয়ে সুখ পাচ্ছেনা। গ্রহে গ্রহান্তরে বেড়াতে চাইছে। স্পুটনিক যাচ্ছে। এর পরে মানুষ যাবে। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার দিনে আমরা সংস্কার মানব! ভূতের ভয়ে অস্বীকার করব সত্যকে! বললুম: চল, আজ তোমাদের শ্মশানটা একবার দেখে আসব।

আমার প্রস্তাব কারও ভাল লাগলনা।

এগারো

দুপুরে ক্যাম্পে ফিরতে আমার একটু দেরি হল। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করেছিলুম। ইচ্ছা ছিল যে ফেরার আগে শ্মশানটা একবার দেখে আসব। শ্মশানের বদনাম সর্বত্রই শুনতে পাই। কোনখানে কোন মানুষকে শ্মশানের প্রশংসা করতে শুনিনি। আজও পর্যন্ত কেউ আমাকে বলেনি যে তাদের শ্মশানটা ভাল, বা সেখানে যেতে কোন ভয়ডর হয়না। এমনি বিচিত্র এই স্থান।

বললুম ঃ চল, শ্মশানটা একবার দেখে যাই।

না বলার সাহস কারও নেই, কিন্তু হাঁ-ও কারও মুখে শুনলুম না। তাদের চোখের দিকে চেয়ে দেখলুম যে বড় অসহায় দেখাচ্ছে তাদের চোখের দৃষ্টি। মায়া হল। জিজ্ঞাসা করলুম ঃ ভয় করছে ?

সোহন কিছু সাহস সঞ্চয় করে বলল ঃ অবেলায় আবার স্নান করতে হবে।

হেসে বললুম ঃ কাছেই তো নদী।

নদীর কথায় ভরসা কেউই পেলনা। তাই দেখে বললুম ঃ তাহলে তোমরা ফিরে যাও। আমি একটু ঘুরে যাব।

এই খালাসিরা আমাদের অনেক সুখ দুঃখের বন্ধু। এদের সবার সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের মিল আছে, আছে একাত্মবোধ। এরাও ঘরছাড়া। দেশের জন্য এদেরও মন টানে, মন খারাপ হয়। কিন্তু কঠিন কর্তব্য এদের বেঁধে রাখে। এই পাহাড়ে বনে, এই লোকালয়ের বাহিরে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে হয়। থাকবনা বললে চলেনা।

সোহন বলল ঃ তা হয়না হুজুর।

কেন হয়না ?

সোহন নিরুত্তর।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ ভূতে খেয়ে ফেলবে ?

না।

তবে ?

একা যাওয়াটা ঠিক নয়।

এ-ও বুঝি সংস্কারের কথা। কিন্তু এ তো কুসংস্কার। বললুম ঃ আলবৎ ঠিক। আমি একাই যাব।

সোহন আর উত্তর দিলনা। এরা তর্ক করেনা, কিন্তু যা ভাল বোঝে তা জোর করেই করে। সরকারী কাজে এই জেদ দেখিনা। সেখানে তাদের নিজেদের কোন মত নেই। যা বলব, তাই করবে। চেন টানতে বলব, অমনি টানবে। গজ ধরতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে সোজা করে ধরবে। ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে বলব, সেই দিকে হেলাবে। কেন, সে প্রশ্ন করবে না। কত বার, সে কথা জানতে চাইবেনা। কখন শেষ হবে, সে সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু একা আমাকে শ্মশানে যেতে দেবেনা। বারণ করলেও শুনবেনা। মার খেলেও প্রতিবাদ করবেনা। তারা যাবেই। একজন অন্তত যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই রফা হল। তিনজন ফিরে যাবে, আর সোহন থাকবে আমার সঙ্গে।

সকালবেলায় এই লোকটিই আমায় খবর দিয়েছিল যে শ্মশানটা খারাপ। এ তল্লাটে লোক খুব ভয় পায়। এতক্ষণ কাজ করেছি, কিন্তু লোক দেখিনি। লোকালয়ও না। সোহনকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। বললুম ঃ শ্মশানের খবর কার কাছে তোমরা পেলে ?

সোহন বলল ঃ আমিই পেয়েছি হুজুর। কাল বিকেলবেলায় বাজারের খোঁজে বেরিয়ে এই খবর পেয়েছি। গাঁয়ের লোক বলল,

খবরদার, নদীর ধার দিয়ে যাবিনে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যা। কেন, জিজ্ঞাসা করতেই খবরটা বেরিয়ে পড়ল।

গ্রাম কতদূর ?

সোহন বলল : এই জঙ্গলটার ওধারে। ভাল চাষ-আবাদ আছে হুজুর, কোন জিনিসের অভাব নেই।

সোহন গল্প করতে ভালবাসে। যতটুকু সুযোগ দেওয়া যায়, তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে। গ্রামের চাষ-আবাদের কথায় আমার আগ্রহ ছিলনা। বললুম : শ্মশানের গল্প কী শুনলে, তাই বল।

ভয়ে ভয়ে সোহন বলল : সে বড় সাংঘাতিক গল্প হুজুর, শুনলে দিনের বেলাতেও ভয় করে। গ্রামের লোকেরা বলল, ওরে, তোরা পরদেশী মানুষ, এসব শুনে তোদের কাজ নেই। যা বলছি, তাই মেনে চল্। ওধার দিয়ে যাতায়াত করবিনা। কিন্তু হুজুর, আমার মন মানল না। বললাম, আমরা আরা জেলার লোক, বেয়াল্লিশ সালে রেলের ডাব্বা নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলেছি। ডর কাকে বলে আমরা জানিনে।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্য আমি বললুম : ঠিক কথা।

হাঁ হুজুর।

বলে সোহন তার লম্বা গোঁফের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিল।

বললুম : তারপর ?

সোহন বলল : আমি মানলাম না হুজুর, জোর করে তাদের গল্প শুনলাম।

সোহন তার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। একধারে কালী নদী, তার ওপারে গভীর অরণ্য স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। এ ধারের বন ক্রমে ক্রমে অগভীর হয়ে লোকালয়ে পৌঁছেছে। শ্মশানের পথ এসেছে ফুরিয়ে। আর একটু এগোলেই বোধহয় সেখানে পৌঁছে

যাব। পরিবেশের ভিতর কেমন একটা থম্‌থমে ভাব। সোহন বলল: এখানেই শুনবেন হুজুর?

কেন, আপত্তি আছে নাকি?

সোহন একটু নম্র স্বরে বলল: জায়গাটা ভাল নয় কিনা হুজুর, তাই বলছিলাম—

ভয় করছে, এই তো?

সোহনের আত্মাভিমানে বুঝি আঘাত লাগল। বলল: ভয় নয় হুজুর। ভাবছিলাম, পথে ঘাটে শ্মশানের গল্পটা ভাল নয়।

আমি হেসে ফেলেছিলুম। কিন্তু সোহন কিছু বলবার সুযোগ পেলনা। হুট্‌ হুট্‌ করে দুবার শব্দ হল। কোন জন্তুর ডাক, না পাখির পাখার শব্দ, বুঝতে পারলুম না। সোহন কিন্তু তটস্থ হয়ে উঠল। বললুম: কি রে, কী হল?

দেখলেন তো হুজুর: সোহন উত্তর দিল: ঐ স্থানের নামেই কেমন বাধা পড়ল।

একটু থেমে বলল: মানুষের বুদ্ধিও কমে যায়। ভাবলাম, এই দূরবীনটার বদলে ঠাঙাটা হাতে নেব। তাও ভুল হয়ে গেল।

হেসে বললুম: কেন রে, ঠ্যাঙাটা থাকলে বুঝি ভূতকে পেটানো যেত?

উত্তরে সোহন 'রাম রাম' বলল।

আমি হাসছিলুম। কিন্তু এই হাসি সোহনের ভাল লাগছিল না। বলল: এসব জায়গায় আসতে হলে ওটাকেও, মানে, কুকুরটাকেও সঙ্গে আনতে হয়। রাম রাম।

ভূতোর কথায় বুঝি ভূতের কথা মনে পড়েছে। তাই রাম রাম।

একেবারে নদীর ধার দিয়ে চলেছি। মনে হল, এখানে যেন বন আরও ঘন, আরও অন্ধকার। কোন দিকে আর সূর্যের আলো এসে

পৌঁছচ্ছে না। মনে হবেনা আকাশে এখন সূর্য আছে। অদ্ভুত শীতল স্থান। মাটি বুঝি ভিজে আছে, স্যাঁতস্যাঁত করছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাউ-এর গাছ থেকে গড়িয়ে নামল। নদীর দিক থেকেও এল আর এক ঝলক বাতাস। শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল।

সোহন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমিও দাঁড়ালুম। কাছে দূরে অনেকগুলো জায়গায় কালো কালো দাগ দেখতে পেলুম। নদীর জল ঘেঁষে পাথরের উপর কালো দাগ। একদিন আগুন জ্বলেছিল, আজ তার দাগ আছে। কিছু পোড়া আধ পোড়া কাঠকুটোও চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হাড়গোড় নেই, নেই অন্য কোন বীভৎস দৃশ্য। সোহন তবু তার দুহাত জুড়ে প্রণাম করল আর বিড়-বিড় করে আওড়াল ঃ রাম রাম।

এই সেই খারাপ জায়গা। কিন্তু আমার কিছু খারাপ লাগলনা। বললুম ঃ এ তো দিব্যি ভাল জায়গা দেখছি। বসবি কিছুক্ষণ? না, ভয় করবে?

সোহন উত্তর দিলনা। আমি জানি, এইখানে দাঁড়িয়ে ভয় করবেনা বলবার সাহস তার নেই। ধৃষ্টতাও নেই। ভয় করবে বলতেও অহংকারে বাধে। তাই তার নিরুত্তর থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সামনে থেকে কালী নদী হঠাৎ বেঁকে গেছে। বেঁকেছে পশ্চিমের দিকে। হঠাৎ মনে হবে, এইখানেই বুঝি নদীর শেষ। চলতে চলতে এই বনের ভিতর নদী তার গতি ফেলেছে হারিয়ে। সোহন আড়ষ্ট ভাবে সেই দিকে চেয়ে বলল ঃ এইবারে চলুন হুজুর, বেলা অনেক হয়েছে।

বেলার ভাবনা কোনদিন তারা ভাবেনি। আজও যে ভাবছেনা, সে আমি নিশ্চয়ই জানি। এ তার ছল মাত্র। তাকে আরও

ভয় দেখাবার জন্য আমি সামনের দিকে পা বাড়ালুম। সোহন বোধহয় আঁৎকে উঠল। বলল : ওদিকে নয় হুজুর, ওদিকে যাবেন না।

গলার স্বর তার কেঁপে উঠল।

ফিরে বললুম : আচ্ছা।

সোহন আমার মুখের হাসি দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার উত্তর দিলনা। ফেরার পথেও ফিরে ফিরে দেখল পিছন দিকে। যে রকমের জায়গা। বলা যায় কি!

হাঁটতে হাঁটতে খোলা জায়গায় পৌঁছে আকাশের সূর্যের দিকে চাইল। বলল : বেলা দেখছেন তো হুজুর। ডবল নাস্তা করে বেরলে আমি তাগাদা দিতাম না।

হেসে বললুম : তা বটে। তুমি আরা জেলার লোক, ভয়ডর তোমার থাকবে কেন! রেলগাড়ির বড় বড় ডাব্বা কাঁধে করে তোমরা গঙ্গার জলে ফেলেছ।

সোহন বুঝতে পারল, আমি তাকে ঠাট্টা করছি। তাই বলল : বড় সাংঘাতিক গল্প শুনেছি হুজুর।

তোমার গল্পের কথা তো অনেকবার শোনালে!

সোহন খানিকক্ষণ ইতস্তত করল, তারপর বলল : এই শ্মশানে নাকি নরবলি হয়েছে।

নরবলি!

হাঁ হুজুর।

কে দিল?

সোহন ভয়ে ভয়ে বলল : কারণবাবা।

সত্যি!

সোহন বলল : সত্যি হুজুর। মানুষ দেখলে ভেড়া বানিয়ে দেন। তারপর অমাবস্যার রাতে—

বাকিটুকু শেষ করবার সাহস তার ছিলনা। কারণবাবা রেলগাড়ির ডাব্বা হলে তার ভয় করবার কারণ ছিলনা। তিনি সাধু, মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ, মানুষকে ভেড়া বানিয়ে পূজার সময় বলি দেন। হয়তো ঐ শ্মশানই তাঁর সাধনার স্থান। আজ তিনি সেখানে থাকলে দুজনকেই হয়তো ভেড়া বানিয়ে দিতেন। তাঁর দুটো অমাবস্যার বলির ব্যবস্থা হয়ে যেত! বললুম: এ জায়গাটাও তো আমাদের জরিপ করতে হবে। কী করে করবে?

সোহন এ কথার উত্তর দিলনা।

বললুম: উত্তর দিচ্ছনা যে?

সোহন বলল: হুজুর, ডিউটি অন্য জিনিস। তার জন্যে প্রাণের ভয়ডর ঘরে রেখে বেরতে হয়।

মনে হল, সোহন একটা সত্য কথা বলেছে। তার মতো আরও অনেকে এই কথা বলবে। কিন্তু সবাই বলবেনা। যদি সবাই বলত, তাহলে দেশের আজ অন্য রূপ হত। দেশের অন্য রূপ যাঁরা দেখতে চান, এই অশিক্ষিতদের কাছে তাঁদের কর্তব্যবোধ শিখতে হবে। এদের আমি শ্রদ্ধা করি।

আমি বেশ দেরিতে ফিরলুম। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলুম যে গোবিন্দ তখনও ফেরেনি। অথচ তার খালাসিরা ফিরে এসেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সে আজও কারণবাবার আশ্রমের দিকে গেছে।

অন্ধকার গভীর হতে লাগল। কিন্তু গোবিন্দ ফিরলনা। একসময় মনে হল, বড় বেয়াড়া তার লোকগুলো। একজনকে ডেকে বললুম ঃ তোমরা তাকে একা ছেড়ে দিলে ?

কী করব হুজুর ঃ মাথা চুলকে সামনে এল একজন ঃ আমরা সঙ্গে যাব বলতে গজ তুলে মারতে এসেছিলেন।

আর তোমরা অমনি পালিয়ে এলে !

আমি ধমক দিলুম।

লোকটা ভয়ে ভয়ে বলল ঃ আমরা যে হুকুমের চাকর।

কথাটা আমি বিশ্বাস করি। সব ব্যাপারেই তারা সব কথা মানে। কাজেই এ কথাও মেনেছে। আমার সোহন হলে কী করত বলতে পারিনে। কারণবাবার গল্প তার শোনা আছে, কাজেই সে বোধহয় একা কিছুতেই যেতে দিতনা। মার খেয়েও সঙ্গে যেত।

জামা কাপড় পরে আমি বাহিরে এলুম। কিন্তু আশ্চর্য হলুম সোহনকে দেখে। আমার হুকুম শোনবার আগেই সে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে তৈরি হয়েছে।

বললুম ঃ ও কী ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সোহন বলল ঃ বন্দুকটা হুজুর সঙ্গে নেবেন, আর টর্চলাইট।

আমাদের কি সারা রাত খুঁজে বেড়াতে হবে?

এ কথার উত্তর সে দিলনা।

আমি দেখলুম, গোবিন্দর দলেরও একটা লোক তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু বড় অপ্রসন্ন মন। বললুম : তুমি আবার কেন যাবে?

মনে হল, লোকটা ক্ষুব্ধ হল। বলল : আপনিও হুজুর এই কথা বলছেন!

কেন?

কিন্তু এই কেনর উত্তর সে আর দিলনা।

শুধু বন্দুক আর টর্চ নয়, ভূতোও আমার সঙ্গে চলল।

পথ চলতে চলতে সোহন বলল : আজকালকার ছেলেছোকরারা খুব পাজি হয়েছে। তা না হলে অমন করে কথা বলে!

গল্পটা আমার সঙ্গে নয়। সে তার সঙ্গীর সঙ্গেই কথা বলছে। আমি আগে, আর তারা আমার হাত দু তিন পিছনে চলেছে। নদীর ধারে পৌঁছে আমরা উত্তরের পথ ধরেছি। সেই পথ! আজ শেষরাতে অন্ধকারে আমি এই পথে এসেছিলুম। ভূতো আমাকে এনেছিল। এবারেও ভূতো নিয়ে যাচ্ছে। সে আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

সোহনের সঙ্গী বলল : এই কাজ আমার বাপ দাদাও করেছে, কিন্তু এত কথা আমরা আজও জানিনা।

জানবি কোথা থেকে : সোহন উত্তর দিল : কংগ্রেসরাজই তো এইসব শেখাচ্ছে।

পিছন ফিরে বললুম : কী শেখাচ্ছে রে?

সোহনরা আস্তে আস্তেই কথা বলছিল। তাই আমার প্রশ্ন শুনে কিছু লজ্জা পেল। বলল : সে সব শুনে আপনার কাজ নেই হুজুর।

বললুম ঃ বল্ না।

সোহনের এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে লাঠি। তবু সেই হাত দুটো কচলাবার ভঙ্গি করে বলল ঃ আমাদের বাপ দাদা বলত, তোদের মনিব হল ৺ভারসীয়র বাবু। তার বড় আর কেউ নেই।

গম্ভীরভাবে বললুম ঃ কংগ্রেসরাজ কী বলে?

বলে ঃ সোহন ইতস্তত করল খানিকক্ষণ, তারপর বলল ঃ বলে, মনিব হল কংগ্রেসরাজ, আর সবাই গোলাম।

আমি বললুম ঃ ঠিকই তো বলে রে!

সোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল ঃ আচ্ছা হুজুর।

আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর বললুম ঃ সেই ছোকরাটা কী বলছিল?

এই প্রশ্ন শুনে সোহন খুশী হল। বলল ঃ শুনেছেন হুজুর?

বললুম ঃ বল্ না।

বলছিল, যা যা, সেজেগুজে সঙ্গে যা। খুব তাড়াতাড়ি তরক্কি হবে, ৺ভারসীয়র হবে।

সোহনের সঙ্গীটা যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল ঃ আপনিই বলুন হুজুর, আমরা কি চাকরি করতে আসি, না প্রাণের টানে আসি! আজকালকার ছোকরাদের কি কোন বোধ নেই?

আমারও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললুম ঃ সত্যি কথা।

এর পরে আর গল্প জমলনা।

কারণবাবার আশ্রম কোথায়, আমি তা জানিনা। এরা জানে কিনা, তাও আমার জানা নেই। বোধহয় জানেনা। সারাক্ষণ তো আমাদের সঙ্গেই আছে। কী করে জানবে!

কারণবাবা নরবলি দেন শুনেছি। নিশ্চয়ই কাপালিক। কপালকুণ্ডলায় কাপালিকের গল্প শুনেছি। নানা কথাও শুনেছি কাপালিকের সম্বন্ধে। তাঁরা মানুষকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেন।

চেহারায় ভেড়া নয়, কাজে ভেড়া। চোখের দিকে চেয়ে এমন জাদু করেন যে সুড়সুড় করে সে পিছন পিছন চলে। তার আর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকেনা। এ সব কথা আমি গোবিন্দর কাছেই প্রথম শুনেছিলুম। সে তখন তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করত, আর যাতায়াত করত একজন তান্ত্রিকের কাছে। সে সব দিনের কথা আমি ভুলবনা।

তান্ত্রিকদের সম্বন্ধেও সে সময়ে আমি অনেক কথা শুনেছি। কত রকম আচার আছে, তার ক্রিয়া-পদ্ধতি, পঞ্চ ম-কারের দার্শনিক ব্যাখ্যা, অঙ্গপূজার তাৎপর্য, ইত্যাদি কোন আলোচনাই বাকি রাখেনি। পাগল হতে আমার আর সময় লাগতনা। এমনি সময় হঠাৎ একদিন গোবিন্দর মোহভঙ্গ হল। সে আর এক গল্প। ভৈরবী নিয়ে গণ্ডগোল। গুরুশিষ্যে প্রায় লাঠালাঠির যোগাড়। গোবিন্দকে আমিই গিয়ে উদ্ধার করে আনলুম।

গোবিন্দ তারপর তান্ত্রিক ক্রিয়া ছাড়ল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই তার শখ জেগে ওঠে। সাজসরঞ্জাম এখনও আছে। নারকেলের পাত্র, নরকপাল, হাড়ের মালা—এইসব। মায়া করে সেদিন এ সব ফেলে দেয়নি। যোগাড় করতে কষ্ট হয়। যদি কখনও কাজে লাগে।

গোবিন্দর পুরনো নেশা আবার জেগে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। আর তা ভাল করে জাগলে কিছুতেই রক্ষে নেই। তাঁবুর ভিতরে তো নিত্য-কর্ম শুরু হয়ে গেছে। বাহিরে হল যাগযজ্ঞ, পুরশ্চরণ, শবসাধনা। সে সব ভয়ানক ব্যাপার। ভাবতে ভাবতেই আমি শিহরে উঠলুম।

ঝাউ-এর বন ক্রমে ক্রমে ঘন হচ্ছে। এ দিকে দু রকমের ঝাউ। একরকম, তার ডগায় শুধু পাতা। চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একগোছা পাতা। পাতা বললে ভুল হবে। সবুজ রঙের নরম কাটি। দোলালে

চামরের মতো দোলে। যেখানে একটু ডাল বেরিয়েছে, তারই মাথায় একটি সবুজ চামর। বাতাস সেঁা সেঁা করে তাকে দোলায়, গাছটাকেও হেলায়। আর এক রকম, ছোট ছোট পাতার থোকা। পাতা এ-ও নয়, আলপিনের মতো কাঁটা, রঙ সবুজ। ডালের যেখানে সেখানে থোকা। এ গাছগুলোও হাওয়ায় দোলে, কিন্তু পাতা দোলেনা।

চীর গাছ দু রকমের দেখিনি।

সোহন তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা কইছিল। হঠাৎ আমার কান সেদিকে গেল। সোহন বলছিল: কারণবাবা পাহাড়ে একটা গুহার মধ্যে থাকেন।

পাহাড় তো নদীর ওধারে!

শুধাল তার সঙ্গী।

আমারও এই প্রশ্ন ছিল। তাই আমি উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সোহন বলল: আরে, আমি কি জানতাম যে বাবার আশ্রমে কোনদিন যেতে হবে? তাহলে না হয় জেনেই নিতাম।

ঠিক কথা। কিন্তু তার সঙ্গী বলল: বাবুদের সঙ্গে থাকলে জেনে রাখতে হয়। তাঁদের তো সব মর্জির ব্যাপার। চল্ বললেই চল্।

এও ঠিক কথা। কিন্তু সোহন বলল: বাবার গল্প শুনে মনে করেছিলাম যে ওখানে গেলে আর ফিরে আসতে হবে না। ও কাজ শ্মশানে যাবারই সামিল। একাদশী অমাবস্যায় বাবা শ্মশানে মড়ার ওপর চাপেন। সন্ধ্যেবেলায় কেউ মরলে আর রক্ষে নেই। বাবা ঠিক ঘাড়ে চাপবেন। সে নাকি কঠিন পূজা, কেউ পারেনা।

গোবিন্দকে কোনদিকে দেখতে পাচ্ছিনা। এমন অনির্দিষ্টভাবে পথ চলারও কোন অর্থ নেই। তাই পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলুম: বাবুকে কোথায় ছেড়ে এসেছ?

কথা বন্ধ করে দুজনেই একসঙ্গে এগিয়ে এল।

বললুম ঃ আমি গোবিন্দবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছি।

সোহনের সঙ্গী বলল ঃ সে জায়গা তো অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি হুজুর।

তবে ?

সোহন বলল ঃ কারণবাবার আশ্রমে যদি গিয়ে থাকেন, তবে মুশকিল আছে।

মুশকিল কিসের ?

জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়।

যে রকম জায়গা দেখে এলুম, তার চেয়েও খারাপ ?

সোহন বলল ঃ রাম রাম !

সমতল ভূমি হলে অন্ধকার এত ঘন হতনা। পাহাড় বলে ছায়া বড় তাড়াতাড়ি নামে। বনও এমন গভীর যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার জমে থাকে। এখন সব দোয়াতের কালির মতো একাকার হয়ে গেছে।

বললুম ঃ গোবিন্দর দেখা কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার ?

মাথা চুলকে সোহন বলল ঃ সেইটেই তো ভাবনার কথা।

বাবার আশ্রমটাও তো তোমাদের জানা নেই ?

সোহন বলল ঃ সেইটে বড় ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার মনে হলনা যে লোকটা তার জন্য এতটুকু দুঃখিত হয়েছে। আশ্রমের পথ জানা থাকলে আজ সেখানে যেতেই হত। 'না' বলার অভ্যাস তাদের নেই। অথচ যাওয়াটাও যে কত ভয়ের ব্যাপার, সে কথা তার জানা হয়ে গেছে। ভাবনা শুধু গোবিন্দকে নিয়ে। তারও একটা খোঁজ পাওয়া দরকার। আমি কথা কইলুমনা দেখে সোহন বলল ঃ গ্রামে গিয়ে কি জিজ্ঞেস করে আসব ?

গ্রাম কতদূর ?

এদিকে কোন গ্রাম আছে কিনা জানিনে, তবে ওদিকের গ্রাম খুব বেশি দূরে নয়।

যেতে আসতে কত সময় লাগবে ?

তা একটু সময় লাগবে। যতটা এসেছি, ততটা ফিরতে হবে। তারপর সোজা পশ্চিম মুখো।

এ পথ কম নয়। তাই ফেরার কথা না ভেবে এগোতেই লাগলুম।

কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে কত এগোন যায় !

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ বোধহয় ডুবে গেছে। জোনাকি এদিকে দেখিনি। শুধু তারার আলোয় কি এই উপত্যকাটা আলোকিত হবে !

পাতার খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কখনও কখনও সোঁ সোঁ করে বাতাস আসছে। ঝাউ-এর পাতার শব্দ। আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

গোবিন্দকে আমরা কতক্ষণ খুঁজব !

পিছন ফিরে দেখলুম সোহন নেই। তার সঙ্গীও নেই। অন্ধকারে তারা হারিয়ে গেছে। তাদের লণ্ঠনের আলোও দেখতে পেলুমনা। আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। কোথায় গেল এরা ! এই একটু আগে তো আমার পিছনে ছিল, কথা বলছিল।

হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ল। বড় ক্ষিধে পেয়েছে। বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে পা দুটো। মাথাটাও বুঝি ঘুরছে। এমন দুর্বল শরীরে কী করে হাঁটছিলুম, ভেবে আশ্চর্য বোধ হল। আমাকে কি টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন অদৃশ্য শক্তি ! ভয়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে ডাকলুম : সোহন !

খচ্ করে একটা শব্দ হল আমার কাছেই, দেশলাই জ্বলল। দেশলাই-এর আলোয় দুজনকেই দেখতে পেলুম। তারা লণ্ঠন ধরাচ্ছে। লণ্ঠন বুঝি নিবে গিয়েছিল।

এতক্ষণে আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি। টর্চটার কথা আমার মনে ছিলনা। এইবার পথের উপর তার আলো ফেলে বললুম: ফিরে চল।

জোরে জোরেই কথাটা বললুম। পাছে তারা মনে করে যে ভয় পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

সোহনরা কোন উত্তর দিলনা। তারা কী ভাবল, সে কথা বুঝতে পারা আমার ক্ষমতার অতীত।

ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে যখন ক্যাম্পে ফিরলুম, তখন মনে হল আমি মানুষ খুন করতে পারি। আমাদের পেট্রম্যাক্সটা খুব উঁচু করে খাটানো। অনেক দূর থেকে তার আলো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খুব কাছে এসে যেন গানের সুর শুনতে পেলুম। আমাদের একটা ছোট রেডিও সেট আছে। ব্যাটারিতে চলে। সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দ তাতে বাংলা গান শোনে। দুজনেরই যখন হাতে কাজ থাকেনা, তখন আমরা দাবা পেতে বসি। গোবিন্দ কি ফিরে এসেছে!

তাঁবুর ভিতর ঢুকে দেখলুম, শুধু ফিরে আসা নয়, রেডিও খুলে একাই দাবা খেলছে। সরু চুরট ধরিয়ে দুজনের চাল একা চালছে। এই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, আমি মানুষ খুন করতে পারি।

সোহন আমার কাঁধ থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল, হাতের টর্চটাও। বলল: মুখ হাত ধুয়ে নিন হুজুর, খাবার তৈরি আছে।

আমি যে ক্ষুধার্ত সে কথা এরা জানে। ক্ষুধার্ত মানুষ অমানুষ, তার প্রবৃত্তি হল আদিম বর্বর। পেটে খাদ্য পড়লে সে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পায়। আমার মনে হল, এই অশিক্ষিত লোকটা বুঝি সেই কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিল।

তেরো

রাত তখন কত হবে জানিনে। ভূতোর বেপরোয়া ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক প্রথম রাত্রির থম্‌থমে আবহাওয়া। কোনদিকে কোন শব্দ নেই। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। ভূতোর গলায় শিকল বাজছিল ঝনঝন করে। তার ডাকের সঙ্গে শিকলের শব্দও থেমে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ হল ভূমিকম্পের আগের অবস্থার মতো।

আমি লাফিয়ে উঠে টর্চটা সংগ্রহ করে নিলুম। অন্ধকারে তাঁবুর ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছেনা। ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে বাহিরে এলুম। আমাদের বড় পেট্রম্যাক্স চারিধারটা আলো করে রেখেছে। কিন্তু দেখতে কিছুই পেলুমনা।

রাম সিং নিঃশব্দে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমিও নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকালুম।

ভূতো আবার সোজা হয়ে উঠল। আমার গায়ের কাছে এসে গা ঘষতে লাগল।

আমি রাম সিং-কে জিজ্ঞাসা করলুম: ব্যাপার কী?

সংক্ষেপে সে উত্তর দিল: কারণবাবা।

আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দেখতে পেলে?

রাম সিং মাথা নাড়ল। মানে, দেখতে পেয়েছে।

আমি আরও বিস্মিত হলুম। বললুম: বল কি!

কিন্তু রাম সিং এ কথার উত্তর দিলনা। সে শুধু প্রশ্নের উত্তর দেয়, তা না হলে চুপ করে থাকে। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলুম: কারণবাবাকে তুমি নিজের চোখে দেখলে?

রাম সিং ঘাড় নেড়ে বলল ঃ হাঁ হুজুর।

সঙ্গে আর কে ছিল ?

রাম সিং তাঁবুর দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ গোবিন্দ ?

জী।

আমি চমকে উঠলুম ঃ গোবিন্দকে তুমি কারণবাবার সঙ্গে দেখলে !

রাম সিং-এর উত্তর তেমনি সংক্ষিপ্ত ঃ হাঁ হুজুর।

এতক্ষণ টের পাইনি যে আরও কয়েকজন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে হল কেউ ছুটে গিয়ে আমাদের তাঁবুর ভিতরেও ঢুকল। পরক্ষণেই বেরিয়ে এলে দেখলুম, সে সোহন। বলল ঃ নেই তিনি।

টর্চ জ্বেলে আমিও দেখলুম তাঁবুর ভিতর ও বাহির। কোথাও সে নেই। ঘড়িতে দেখলুম, রাত বারোটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। আমাদের এই কৃত্রিম আলোর পরিধির বাহিরে অমাবস্যার অন্ধকার থিতিয়ে আছে। সেদিকে যাবার কথা ভাবতে ভয় হয়।

রাম সিং তবু একটা লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে এল। তাই দেখে সাহস হল। বললুম ঃ চল।

এই চলার উদ্দেশ্য কী জানিনে। রাম সিং-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে কারণবাবা উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছেন, মানে, শ্মশানের দিকে। অমাবস্যার রাতে হয়তো কোন ক্রিয়া করবেন। কিংবা শবসাধনা। আমাদের তাতে দরকার নেই। শুধু গোবিন্দর জন্যই আমাদের মাথাব্যথা। কিন্তু সে কেন ছুটল ? আগে থেকেই কি সে তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছিল ? আমাদের তাহলে জানানো উচিত ছিল। তাতে আর কিছু না হোক, আমাদের এই হয়রানিটা বাঁচত।

আমার পিঠে বন্দুক আছে, হাতে টর্চ। সামনে সোহনরা দুজন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে চলেছে। দিনের বেলায় যে-শশ্মানে যেতে এদের ভয়ের অন্ত নেই, এই অন্ধকার রাতে সেখানেই এরা নির্ভয়ে চলেছে। আমি তাদের যেতে বলিনি। একা যেতে ভয় করলেও এদের যেতে বলতুম না। এরা স্বেচ্ছায় এসেছে। এদের নাড়িতে যে কর্তব্যবোধ, সে এ যুগের নয়। এ কালের ছেলে আইন জানে, আন্তরিকতা জানেনা। তর্ক শিখেছে, ত্যাগ শেখেনি। কিন্তু এই পুরনো অশিক্ষিত মানুষগুলোর কর্তব্যবোধের পরিধি অনেক বড়। সরকার-নির্দিষ্ট কাজ থেকে প্রভুর সেবা পর্যন্ত সবই তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই চেতনা থেকে তারা প্রেরণা পায়। ভয়-ডর অগ্রাহ্য করে দুঃসাহসের কাজ করে।

চলতে চলতে আমি তাদের কথাই ভাবছিলুম। আর কান পেতে শুনছিলুম তাদের গল্প। সোহন বলছিলঃ গোবিন্দবাবু একটু ঐ ধরনের।

ঐ ধরনের মানে?

তার সঙ্গী জানতে চাইল।

সোহন বললঃ একটু কেমন-কেমন।

তার সঙ্গী বিরক্ত হল, বললঃ তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই। ভাল করে বুঝিয়ে বল।

সোহন ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বললঃ যখন কাজ করে তো খাওয়া-দাওয়ার কথা সব ভুলে যায়। আবার যখন করেনা, তখন সারাদিন শুয়েই কাটায়।

গম্ভীরভাবে তার সঙ্গী সমর্থন করল, বললঃ তা ঠিক।

সোহন বললঃ ঠিক মানে? আলবৎ ঠিক। আজ দেখলিনা, না-খেয়ে না-দেয়ে সারাদিনটাই কাটিয়ে দিল। আর আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।

তার সঙ্গী বলল : এখন কী হবে ?

সোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মানে, ভগবান জানেন।

সকলের সামনে চলছিল ভূতো। লাফিয়ে লাফিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে।

সোহনের সঙ্গী বলল : দিনটা আজ ভাল নয়।

সোহন বলল : অমাবস্যা নয়তো !

অমাবস্যার নামে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অদ্ভুত অন্ধকার। একদিকে অরণ্যময় পাহাড়, দুরন্ত নদী কালী বইছে তারই কোল ঘেঁষে। অন্যদিকে গভীর বন। গ্রামের দিক থেকে স্তরে স্তরে দুর্গম হয়ে বন এই নদীর তীরে এসে মিশেছে। মাথার উপরে আকাশ দেখা যায়না। গাছে গাছে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দু-একটা তারা দেখে সন্দেহ হয় যে সে বুঝি জোনাকি। গাছের পাতায় আটকে আছে। যেদিকে আমরা চলেছি, সে স্থান আরও অন্ধকার। দিনের বেলাতেও যে সেখানে আলো পৌঁছয়না, তা আমরা দেখে এসেছি। আজ কী দেখব, তা ভাবতে ভয় করছে।

সেদিন আমরা গোবিন্দকে খুঁজে পেয়েছিলুম অচেতন অবস্থায়। কেন জানিনা, আজও ইচ্ছা হল তাকে অচেতন দেখবার। চলতে চলতে যদি তাকে পথের ধারে কুড়িয়ে পাই, তাহলেই যেন ভাল হয়। তাহলেই আনন্দ পাই বেশি। কিন্তু কেন এমন ইচ্ছে হল, সে কথা ভাবতে গিয়ে শ্মশানের কথা মনে হল। তাকে খুঁজে পেলে শ্মশানে আমাদের যেতে হবেনা, যেতে হবেনা কারণবাবার কাছে। এমন শ্মশানচারী মানুষের কাছে না যাওয়াই মঙ্গল।

সোহন বলছিল : কিরে, অমাবস্যার নামে ভয় পেলি নাকি ?

তার সঙ্গী বলল : ভয় পেলেই বা উপায় কী !

সোহন তাকে সাহস দিল। বলল : বাবুর হাতে বন্দুক আছে।

বন্দুক : লোকটা হাসল : ভূত-প্রেতের ওপর কি বন্দুক চলবে !

রাম রাম, রাম রাম।

সোহন বুঝি নিজেকেই সাহস দেবার চেষ্টা করল।

তার সঙ্গী হঠাৎ বলে উঠল: জরিপের চাকরি যেন বংশে কেউ না নেয়।

আমি জানি, এ তার মনের কথা। তার কেন, অনেকেরই মনের কথা। পেটের জন্য কত লোককেই তো দেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু সারা জীবন মাঠে-ঘাটে ঝাড়ে-জঙ্গলে কাটাতে হয়না। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যায় মাথার উপর দিয়ে। রাতে ঘুম হয়না বাঘ-ভালুকের ভয়ে। কোথাও মশা, কোথাও জোঁক, কোথাও বা রোগ আর দুর্ভোগ। লোকটা ঠিকই বলেছে, জরিপের চাকরি যেন বংশে কেউ না নেয়।

সোহন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গীও দাঁড়াল। টর্চ ফেলে দেখলুম, ভূতো আর এগোচ্ছেনা। শুধু লেজ নাড়ছে। গায়ে আলো পড়তেই লাফিয়ে পেছিয়ে এল। আমার পায়ে গাল ঘষতে লাগল ব্যস্ত ভাবে।

আমি লক্ষ্য করলুম, ভূতো আজ ঘেউ ঘেউ করলনা। কিছু যে দেখতে পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখতে পেয়েও চুপ করে রইল। নিশ্চয়ই চেনা মানুষ দেখেছে।

আমি আলো নিবিয়ে অন্ধকারের ভিতরেই দেখবার চেষ্টা করলুম। সোহনদের বললুম, পিছিয়ে আসতে। খুব আস্তে আস্তে। কিন্তু উপর থেকে হুট-হুট করে কে সাড়া দিল। জন্তুর আওয়াজ, কি পাখীর ডাক, তা বুঝতে পারলুম না। গায়ে তবু কাঁটা দিয়ে উঠল।

খানিকটা তফাতে মনে হল, গোবিন্দর মতো কে একজন পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। মানুষ চিনতে ভূতোর কখনও ভুল হয়না। কিন্তু সে-ও আজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে লেজ নাড়ছে। আমি স্তব্ধ হয়ে পরিবেশটা হৃদয়ঙ্গম করলুম। গোবিন্দ নিশ্চয়ই আমার বেশি আগে বেরয়নি। হয়তো ছুটে এসেছে বলে কিছু আগে

পৌঁছেছে। কারণবাবার সঙ্গে ব্যবস্থা করা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি এমন নিশ্চিন্তমনে ধ্যানে বসতে পারতনা। তিনিও হয়তো কাছে কোথাও যোগে বসেছেন।

আমার কৌতূহল হল উদ্দীপিত। পিছিয়ে এসে সোহনকে বললুম ফিরে যেতে। গোবিন্দর শ্রবণ বাঁচিয়েই কথাটা বললুম। সোহন চমকে উঠল। বলল: এই শ্মশানের ভেতর আপনাকে ফেলে যাব!

বললুম: তা ছাড়া যে উপায় নেই। এতগুলো মানুষ থাকলে এদের কাণ্ড-কারখানা আর দেখা যাবেনা।

দেখে আশ্চর্য হলুম, সোহন কোন তর্কে প্রবৃত্ত হলনা। তার সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার প্রহরী রইল ভূতো। খানিকটা তফাতে থাবা পেতে বসে আমাকে সাহস যোগাতে লাগল অযাচিতভাবে।

দূরে নদীর জলের কাছে অল্প অল্প আগুন জ্বলছে। মনে হল, সেই আলোর কাছে আমি কারণবাবাকে দেখতে পাচ্ছি। কারণবাবাকে আমি চিনিনা, কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তিনি ছাড়া যে আর কেউ এই অমাবস্যার রাতে শ্মশানে সাধনা করতে আসবেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। কারণবাবা কি এসেই এখানে ধুনি জ্বেলেছেন? কিন্তু এ তো নতুন আগুন নয়, এ আগুন তো নিবে আসছে। তবে কি কোন চিতার আগুন!

চিতার কথাতেই শব-সাধনার কথা মনে এল। শুনেছি শ্মশানচারী তান্ত্রিকরা নাকি চিতার শবকেও টেনে বার করে তার উপর সাধনায় বসেন। এমনই বীভৎস এঁদের ক্রিয়াকলাপ যে এঁদের দেখলেই শ্মশানযাত্রীরা শব ফেলে পালিয়ে যায়। ছেলেবেলায় এই সমস্ত ঘটনার অনেক মুখরোচক গল্প শুনেছি। তারপর শুনেছি গোবিন্দর

কাছে। চণ্ডালের মৃত দেহ নাকি প্রকৃষ্ট। সেই মৃত্যু যদি লাঠি খড়গ বা বজ্রের আঘাতে, শূলের উপরে, বা সর্প-দংশনে হয়ে থাকে, তাহলে আরও ভাল। যুদ্ধে নিহত বা জলমগ্ন হলেও ভাল। তরুণ কান্তিমান দেহ হলে তো রীতিমতো উপাদেয়।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, কারণবাবা বসে নেই। তিনি কিছু করছেন। সেই অস্পষ্ট আলোয় মনে হল, তাঁর সামনে একটা শব দেখতে পাচ্ছি। তিনি বোধহয় শবেরই পূজা করছেন।

গোবিন্দ বলেছিল, অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে শব-সাধনা করতে হয়। স্থান-নির্বাচনের একটা নির্দেশ আছে। নির্জনে শূন্যগৃহে বিল্বমূলে কিংবা বন পর্বত নদীতীর বা শ্মশানে এই সমস্ত ক্রিয়া করা উচিত। কারণ ও উপচার নিয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেরতে হবে। প্রথমে পূজা করতে হবে গুরু গণেশ ও যোগিনীর। তারপর বলিদান। কারণবাবার বলিদান আজ হয়েছে কিনা আমি দেখতে পাইনি।

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি কারণবাবাকে লক্ষ্য করছিলুম। এবারে মনে হল, তিনি শবের পিঠে কিছু মাখাচ্ছেন। গোবিন্দর কাছে শুনেছিলুম, চন্দন লেপন করতে হয়। তার পর কিছু পাতলেন। বোধহয় কম্বল ও মৃগচর্ম। গোবিন্দর কাছে আমি তাই শুনেছিলুম। গোবিন্দ বলেছিল যে কোন একটা তন্ত্রে আছে, মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধ্যায় ভেড়া ছাগল মহিষের শব গ্রামের বাহিরে কোন জায়গায় ফেলতে হয়। আর তার সঙ্গে দীপযুক্ত কবন্ধ। সাধক মাঝখানের একটা কবন্ধের উপর গন্ধর্ব রূপে আরোহণ করে সাধনা করবে। গন্ধর্বের রূপটা আমার মনে আছে। মুখে পান আর চোখে কাজল। তাহলেই হল।

কারণবাবা যখন উঠে দাঁড়ালেন, ভয়ে আমি কণ্টকিত হয়ে উঠলুম। অস্পষ্ট আলোতেও আমি স্পষ্ট দেখলুম, তাঁর গলা থেকে কয়েকটা

নরমুণ্ড ঝুলছে। কয়েকটা ধব্‌ধবে সাদা বস্তুর উপরে কালো কালো গর্ত। আমার দিকে চেয়ে যেন দাঁত বার করে বিদ্রূপ করছে। তারপর—

তারপর যা দেখলুম্‌, তা বলতে পারবনা। এমন বীভৎস দৃশ্য বুঝি কল্পনা করাও যায়না। গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু কারণবাবা ক্ষেপে গেলেন। যথেচ্ছ ভাষায় গালাগালি শুরু করলেন।

আমি কী করব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ দেখলুম, দুধার থেকে দুটো লোক ছুটে এসে গোবিন্দকে আমার কাছে টেনে আনল! হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ভূতোর লেজনাড়া দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে চিন্তার কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত হলুম সোহনের গলা শুনে। বলল: পালিয়ে চলুন হুজুর। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

গোবিন্দর হাত ধরে ওরা ছুটছিল। আমিও ছুটলুম। ভূতো আমার পাশে পাশে ছুটতে লাগল।

চোদ্দ

অনেকটা পথ দৌড়ে এসে আমরা দাঁড়ালুম। সোহনরাও গোবিন্দর হাত ছেড়ে দিয়েছে। ভূতো দেখলুম চারিদিকে নজর রেখেছে, পিছনেও দেখছে ফিরে ফিরে। অন্ধকার বন ছাড়া আর কিছু আমাদের নজরে পড়লনা।

অনেকক্ষণ চলবার পরে সোহন বলল: কারণবাবার থাঁড়াখানা দেখেছিলেন হুজুর?

বললুম: না তো।

সোহন বলল: আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম।

তারপরেই শিহরে উঠল। অন্ধকারেও আমি তার আতঙ্ক দেখলুম স্পষ্টভাবে।

বললুম: তাতে ভয় কিসের?

আস্তে আস্তে সোহন বলল: এ পর্যন্ত উনি একহাজার নরবলি দিয়েছেন, আর আটটা দিলেই ওঁর একটা সংকল্প পূর্ণ হবে। গাঁয়ের লোক বলছে, অন্ধকারে মানুষ দেখলে বাবা আর ছেড়ে দিচ্ছেন না। মন্ত্র পড়ে ভেড়া বানিয়ে দিচ্ছেন। তারপর এই শ্মশানে এনে—

বাকিটুকু সে আর বলতে পারলনা। তার সঙ্গী বলল: আমাদের বাপ-মায়ের অনেক পুণ্য, তাই আজ রক্ষা পেয়ে গেলাম।

বাপ-মায়েরই পুণ্য বটে: আমি উত্তর দিলুম: তা না হলে আজ বাবার এক রাতেই চারটে বলি মিলত।

সোহন বুঝি আর্তনাদ করে উঠল: রাম রাম!

কারণবাবাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। আবছায়া আলোয়। কাপালিক বলতে আমার চোখের সামনে যে মূর্তি ভেসে ওঠে, ঠিক

তার উল্টো। কেন জানিনা, আমার ধারণা হয়েছে যে কাপালিকরা বিরাট পুরুষ। দীর্ঘাঙ্গ, সুগঠিত কঠিন দেহ, লাল টকটকে ফরসা রঙ। মুখে গোঁফ দাড়ি আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু কারণবাবাকে বেঁটেখাটো রোগা মানুষ বলেই মনে হল। রঙও বোধহয় ময়লা। অন্তত অন্ধকারে তাই দেখছিলুম। মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ি। যখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁকে ধনুকের মতো বাঁকা দেখাচ্ছিল। বললুম ঃ মানুষ হয়ে মানুষকে ভয় পাচ্ছিস ?

গম্ভীরভাবে সোহন বলল ঃ মানুষই তো মানুষের শত্রু হুজুর। মানুষকে তো বাঘে খায়না, ভগবানও মারেনা। মিছিমিছি আমরা ভগবানের দোষ দিই।

হয়তো কথাটা সত্য ! কিন্তু এদের মুখে তেমন মানায়না। আমি গল্প করছিলুম গোবিন্দর জন্য। তার কথা বলা দরকার। কিন্তু কিছুতেই এখন সে বলবেনা। প্রশ্ন করলেও উত্তর দেবেনা। আমাদের কথার ভিতর অতর্কিতে যদি বলে ফেলে, সেইজন্যই সোহনের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি। বললুম ঃ আমার কুষ্ঠিতে কিন্তু এই কথাই লেখা আছে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে সোহন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ মানুষের হাতে আমার মৃত্যু হবে।

আপনার !

সোহনের বিস্ময় দেখে মনে হল যে এই কথাটা আমার ক্ষেত্রে তত বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছেনা। যদি গোবিন্দর হত, তাহলে খুব সহজেই মেনে নেওয়া যেত। এখানে এসে অবধি গোবিন্দর আচরণ বদলে গেছে। হয় কিছু ভাবছে, নয় বেয়াড়া ব্যাপার কিছু করে বসছে। এ সমস্ত যে কারণবাবার কারসাজি, তাতে আর কারও সন্দেহ নেই। তিনি না টানলে গোবিন্দ এমন ছুটে ছুটে বেরবে কেন !

এখানেই যদি সব কিছুর শেষ হত, তাহলে ভাবনা ছিলনা। মনে হচ্ছে, এই তো সবে শুরু। এর পরিণামটা আমরা ভাবতে পাচ্ছিনা। আমাদের কল্পনায় যে পরিণাম, সে বড় নির্মম, বড় ভয়ানক। সে কথা ভাবতেও বুকের রক্ত একেবারে জমে যায়! কিছুতেই আমরা তা ভাবতে পারিনে।

এক সময় আমরা সমস্ত পথ অতিক্রম করে ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। পথে গোবিন্দ একটা কথাও বলেনি। বলল নিজের তাঁবুতে ঢুকে : কাজটা তোমরা ভাল করনি।

আমি কোন উত্তর দিলুমনা।

গোবিন্দ বলল : আমি বাবার উত্তরসাধক হয়ে বসে ছিলুম। তোমরা জোর করে আমায় ধরে আনলে।

কথা শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। তবু আমি চুপ করে থাকলুম।

গোবিন্দ বলল : শ্মশান-সাধনার একটা সুযোগ পেয়েছিলুম। তোমরা আমায় সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে।

তোমার লজ্জা করেনা : আমি আর উত্তর না দিয়ে থাকতে পারলুম না : আমরা তোমায় চেঁচিয়ে উঠতে বলেছিলুম, তাই না।

গোবিন্দ সত্যিই লজ্জা পেলনা। বলল : প্রথম প্রথম শ্মশানে গিয়ে সবাই চেঁচায়। বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রো, তিনি নিজেও বোধহয় চেঁচিয়েছিলেন।

বললুম : আমরা তো চেঁচাইনি। যে সোহন দিনের বেলায় শ্মশানের নাম করতে ভয় পায়, উঠতে বসতে রাম নাম করে, সে কিনা তোমাকে উদ্ধার করে আনল!

গোবিন্দ বলল : তোমরা কেন বিভীষিকা দেখবে! ও তো আমাদের দেখবার জিনিস! তবে সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই

এত বিঘ্ন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই কালীর দর্শন মেলে।

আমি বিশ্বাসের প্রশ্ন তুললুম না। বললুম ঃ সিদ্ধিলাভের চেষ্টার আগে নিজের মাথাটা ঠিক রেখো। ওখানে গোলমাল হলে সবই ব্যর্থ। একেবারে সন্থ সিদ্ধি!

সেই সঙ্গেই যোগ করলুম ঃ প্রাণের কথাটাও মনে রেখো। ওটাও গেলে আর ফিরে পাবেনা।

গোবিন্দ এ সব কথার উত্তর দিলনা। খাটে উঠে সটান শুয়ে পড়ল।

আমিও শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুম যে আর আসবেনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম।

গোবিন্দও উসখুস করছিল। তাই দেখে বললুম ঃ ঘুম আসছেনা বুঝি?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

বললুম ঃ কার কথা ভাবছ? কারণবাবার, না পেমার দিদির?

কী যা-তা বলছ!

হেসে বললুম ঃ চটছ কেন! পুরাকালে ঋষিদের তপোভঙ্গ হয়েছে, আর আমাদের হলেই দোষ!

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে রইল।

বললুম ঃ সত্যি বলছি ভাই, মেয়েটাকে দেখে অবধি আমার মনটাও বড় উতলা হয়েছে। এমন রূপ অনেকদিন চোখে পড়েনি!

আমার মনে হচ্ছিল, শব-সাধনার চেয়ে প্রেমে পড়া ভাল। দুটো রোগেই মাথা খারাপ হয়। কিন্তু একটা আর একটার চেয়ে এক হিসেবে ভাল। শব-সাধনায় মাথা খারাপ হলে সারাবার পথ থাকেনা, কিন্তু প্রেমে পড়ে মাথা বেগড়ালে মেরে ভূত নামানো যায়। এই ধারণা থেকেই আমি সোমার গল্প শুরু করেছি।

কিন্তু তার পর?

তারপর আর ভাবতে পাচ্ছিনে। তারপরের ভাবনা পরেই ভাবব। আপাতত তো তাকে শ্মশান থেকে আশ্রমে ফেরাই। বললুম: সোমাকে বেশ ভাল করে দেখেছ তো?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

কিন্তু অনেক কথা আমার জানবার ছিল। বললুম: ঐ পরিবেশে তাকে খুশী দেখলে?

না।

তবে কি সে দুঃখে আছে?

তাও না।

তবে?

গোবিন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল: জানিনা।

কেন?

কেন আবার! এ সব কথা সে আমাকে কেন বলবে!

সে বলবে কেন! নিজের তো একটা ধারণা আছে! তাকে দেখে তোমার নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছে। আমি সেই কথাই শুধু জানতে চেয়েছি।

গোবিন্দ সংক্ষেপে বলল: তুমি নিজে জানতে যেয়ো।

দেরি না করে আমি বললুম: আমিও তাই ভাবছি।

দম দেওয়া পুতুলের মতো গোবিন্দ সোজা হয়ে উঠে বসল। বলল: কী ভাবছ?

মনে মনে আমি হাসছিলুম। বললুম: ঐ তান্ত্রিকটার হাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করা দরকার। কোথায় একটা সুস্থ পুরুষের সঙ্গে ঘর করবে, তা নয় ঐ বীভৎস বুড়োটা! মেয়েটা এতদিন কেন আত্মহত্যা করে মরেনি, তাই ভাবি।

গোবিন্দ আমাকে ধমক দিল। বলল: তুমি গিয়ে কী করবে?

কী করব ঃ আমি উত্তর দিলুম ঃ সোজা গিয়ে ভাব করতে শুরু করব। বোঝাব যে ইচ্ছে করলে সে একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে, এবং তাই তার করা উচিত। ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে সে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভেতর আটকা পড়েছে, অবিলম্বে তার বেরিয়ে আসা উচিত।

যদি না আসে ?

টেনে আনব। টেনে আনতেই তো যাচ্ছি।

কারণবাবা তোমাকে ছেড়ে দেবেন ভাবছ ?

সহজে ছাড়বেন না। কিন্তু আমিও ছাড়াতে জানি। দরকার হলে পুলিস ডাকব।

গোবিন্দ গম্ভীর গলায় বলল ঃ বাবার যৌগিক ক্ষমতার কথা ভেবেছ ?

তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম ঃ কী করবেন শুনি ?

কী করবেন ঃ গোবিন্দ একটু থেমে বলল ঃ মারণ-উচাটন কোন কিছুই বাবার অজ্ঞাত নয়। শব-সাধনায় সিদ্ধপুরুষ কখনো পুলিসের ভয় করেনা।

বললুম ঃ সে দেখা যাবে। আগে তো মেয়েটার সঙ্গে ভাব করি।

খবরদার ঃ গোবিন্দ আমাকে সতর্ক করল ঃ তুমি ওধারে যাবেনা।

বললুম ঃ তুমি বুঝি ভাব জমিয়েছ ?

উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ শুয়ে পড়ল।

আমি হাসলুম মনে মনে।

পনরো

পরদিন দুপুরবেলায় ক্যাম্পে ফিরে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। গোবিন্দ তার আগেই ফিরে এসে সবাইকে তাড়া দিচ্ছে। তার তখনই বেরতে হবে। কিন্তু তাড়া দিচ্ছে আমার জন্যই। আমি এত দেরিতে কেন ফিরি। স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে অনিয়মে। তাকে এই খবরটা এতদিন দেওয়া উচিত ছিল। তাহলেই সে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারত। আমি যে ফিরেছি, তা সে টের পায়নি। রাম সিং-কে বললুম: জিজ্ঞেস কর তো, তার নিজের স্বাস্থ্যের সে কী যত্ন নিচ্ছে?

তুমি ফিরেছ: গোবিন্দ আমার দিকে ফিরে তাকাল: আর তর্ক নয়। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমাদের এখুনি বেরতে হবে।

বললুম: কোথায় যাবে বল তো?

কেন, কাল তো তুমিই যেতে চাইলে: গোবিন্দ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল: কারণবাবার সঙ্গেও তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। তন্ত্রমন্ত্রের যা কিছু ব্যাখ্যা তোমার দরকার, সবই তাঁর কাছে জেনে নিয়ো।

আর তুমি কী করবে: আস্তে আস্তে আমি যোগ করলুম: আড়ালে গিয়ে সোমার সঙ্গে বুঝি ভাব করবে?

গোবিন্দর মেজাজ আজ প্রসন্ন ছিল। বলল: তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

হেসে বললুম: ছিটেফোঁটা আমাকেও দিয়ো।

খেয়ে দেয়ে দুই বন্ধুতে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। বড় বড় ঝাউ গাছগুলো সূর্যকে আড়াল করতে পারেনি। গাছের ফাঁক দিয়ে

রোদ ঢুকছে। ছড়িয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। আলো-ছায়ার এই খেলা আরও অনেকক্ষণ চলবে।

চলতে চলতে গোবিন্দ বলল : কাপালিক দেখেছ আগে?

বললুম : দেখেছি!

দেখেছ!

বললুম : কপালকুণ্ডলার কাপালিককে দেখেছি।

গোবিন্দ প্রাণভরে হাসল। বনের ভিতর এই হাসির শব্দ ভারি অদ্ভুত শোনায়। মনে হয়, চারিদিকের গাছগুলো এই হাসি শুনে তটস্থ হয়ে উঠছে। কারণ জানতে চাইছে। ভাবছে, পাগল নয়তো লোকটা। অনেকক্ষণ তারা কান পেতে থাকে। শোনবার চেষ্টা করে পরের কথাগুলো। আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছগুলো সব অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

গোবিন্দ বলল : কী দেখছ চারিদিকে?

আমি আমার পাগলামির কথা তাকে বলতে পারলুল না। বললুম : ভূতোটাকে সঙ্গে আনলে ভাল হত।

ভূতের ভয় করছে বুঝি? কিন্তু তোমার ভূতো কারণ-বাবার ভূত তাড়াতে পারবেনা। না এনে ভালই করেছ।

ফেরার সময় সাহস যোগাত। অন্তত সময়মতো যে সতর্ক করতে পারত তাতে সন্দেহ নেই।

গোবিন্দ এ কথা মানলনা। বলল : কারণবাবার সঙ্গে পরিচয় হলে বুঝতে পারতে যে সে সবের কোন প্রয়োজন নেই। বিপদ আসে অতর্কিতে, সতর্ক হবার সুযোগ দিয়ে আসেনা। তা এলে, সবারই সুবিধে হত।

বললুম : এইজন্যেই তো ভূতোকে আমি ভালবাসি। বিপদের কথা সে আমার আগেই টের পায়।

হঠাৎ গোবিন্দ বলল : দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছ?

আমি চমকে উঠেছিলুম। দেখতে পেয়ে গোবিন্দ বলল ঃ চমকাবার মতো কিছু নয়। মানুষ মনে হচ্ছে, তাই না ?

মানুষ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কজন ? গ্রামের দিক থেকে আসছে পাহাড়ের দিকে। মাঝে মাঝেই তারা হারিয়ে যাচ্ছে বড় বড় গাছের আড়ালে। এবারে তাদের ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলুম। একজন পুরুষ লাঠি হাতে চলেছে সন্তর্পণে। আর একজন তার পাশে পাশে। পাশের মানুষটি কি একটি মেয়ে ? তার পরনে তো আঁটসাট পা জামা দেখছিনে, দেখছি ঘাগরার মতো রঙীন কাপড়। দুটো পা টেনে টেনে চলছেনা, একটি দেহ সাবলীল গতিতে চলছে।

গোবিন্দর দৃষ্টি বোধহয় আমার চেয়ে ভাল। বলল ঃ লোকটা বোধহয় অন্ধ। মেয়েটার হাত ধরে চলেছে।

আমি মিলিয়ে দেখলুম। মনে হল, গোবিন্দ ঠিকই বলেছে। বললুম ঃ বোধহয় তাই।

গোবিন্দ বলল ঃ বোধহয় কেন, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে।

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিনে। বললুম ঃ আমার দূরদৃষ্টি নেই।

গোবিন্দ বলল : সংসার-যাত্রায় দূরদৃষ্টির প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি।

দূরদৃষ্ট বেশি কিনা, তাইতেই চলে যাচ্ছে।

গোবিন্দ আবার হেসে উঠল।

গোবিন্দর আজ আমি অন্য রূপ দেখতে পাচ্ছি। বড় প্রসন্ন মন, দরাজ মেজাজ। বললুম ঃ ব্যাপারটা কী বল তো !

গোবিন্দ বলল ঃ তার তাড়া কিসের ! নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।

বলতে কি বাধা আছে ?

তোমার কাছে কিছুরই বাধা নেই।

তবে আর কি !

বলে তার মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু গোবিন্দ অন্য কথা বলল : ওরা কোথায় যাচ্ছে বলতে পার?

বুঝতে পারলুম, গোবিন্দ আমার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেল। তাই আমিও কোন উত্তর দিলুম না।

গোবিন্দ বলল : ওরাও যাচ্ছে কারণবাবার আশ্রমের দিকে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : সেকি, সেখানেও কি মানুষ সাধ করে যায়?

গোবিন্দ হেসে বলল : বাবার সম্বন্ধে তোমার কিছুই জানা নেই, অথচ একটা ধারণা পুষছ মনে মনে।

ধারণা আমার নিজের নয়, দশজনের ধারণাকেই আমি নিজের বলে মেনে নিয়েছি।

বুদ্ধিমান লোকেরা কী বলে জান?

অনেক কথাই বলে।

তার একটি হচ্ছে, নিজে দেখে নিজে বিচার করে ধারণা করবে। পরের ধারণা সম্বল করে নিজে কোন কাজ করতে নেই।

বললুম : বুঝেছি। তুমি বলতে চাও যে ঐ কাপালিকঠাকুর একজন মহাপুরুষ।

গোবিন্দ বলল : একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও। কারণবাবার সম্বন্ধে ওদের কী ধারণা তা জানা যাবে।

তোমার নিজের ধারণা বুঝি বলতে চাওনা?

তাতে তোমার নিরপেক্ষ বিচারের অসুবিধা হবে।

কাজেই আমরা পা চালিয়ে চললুম। প্রতি পদক্ষেপে মনে হল তারা আমাদের কাছে সরে আসছে। আরও একটু এগিয়ে দেখলুম, তারা সরে আসছেনা, এত ধীরে ধীরে হাঁটছে যে সে দাঁড়িয়ে থাকার মতন।

গোবিন্দ বলল : লোকটা যে অন্ধ তাতে সন্দেহ নেই।

কেন বল তো ?

দেখছনা, জোয়ান মানুষটা কেমন এলোমেলো লাঠি ফেলছে! মেয়েটা ওকে নিয়ে যাচ্ছে, তবু বেশি সাহস পাচ্ছেনা।

ওরা বসে পড়লনা ?

তাইতো দেখছি।

আশ্রম আর কতদূর ?

গোবিন্দ হেসে বলল : নদীর ওপারেই আশ্রম।

ওপারে !

আমি বিস্মিত হলুম অপরিমিত।

গোবিন্দ বলল : ভয় নেই, নদীর উপরে ভাল পুল আছে।

তবে যে সেদিন আমি এপারে দেখলুম মেয়েটাকে ?

তাতে কী হয়েছে : গোবিন্দ উত্তর দিল : আমাদের ক্যাম্পেও তো সে কোনদিন আসতে পারে।

আমার একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

অন্ধ মানুষটা বসে ছিল নদীর ধারেই। বোধহয় জিরিয়ে নিচ্ছিল। আমরা কাছাকাছি পৌঁছতেই মেয়েটা এগিয়ে এল। সোমার বয়সী সুশ্রী মেয়ে, কিন্তু বড় বিষণ্ন মুখ। অনেক গ্রীষ্মের বেদনার দাহে ভিতরটা বুঝি জ্বলছে। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করল পাহাড়ী হিন্দীতে : কারণবাবার আশ্রমটা আর কতদূর ?

গোবিন্দর যেন কতকালের চেনা, এমনি সহজভাবে বলল : তা চল না, আমি তোমায় পৌঁছে দেব।

পৌঁছে দেবে ?

মেয়েটার বিষণ্নতা অন্তর্হিত হল। ছুটে গিয়ে সঙ্গী পুরুষটাকে বলল উঠতে, নিজে তার ছোট পুঁটুলিটা হাতে তুলে নিল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, তার পিঠেও একটা পুঁটুলি বাঁধা। একটি কচি ছেলে নেই তো ওর ভিতর !

চলতে চলতেই গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল: তোমরা বুঝি অনেক দূর থেকে আসছ?

মেয়েটা বলল: তা দূর বৈকি। দুদিন আমরা হাঁটছি।

দুদিন! —ভাবতে আমার কষ্ট হল।

মেয়েটা বলল: দেখনা এই লোকটাকে। বনের জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে চোখটা নষ্ট করেছে। আর সারা গায়ে ঘা।

পরম স্নেহের সুরে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল: বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছে বুঝি?

মেয়েটা বলল: বাঘ হলে তো ভাল ছিল, পেছন থেকে চোখে থাবা মারতনা। ওটা ছিল বেইমান নেকড়ে। সামনা সামনি আসবার সাহস নেই বলে পেছন থেকে আসে।

গোবিন্দ বলল: তারপর?

তারপরের কথা বলল ছেলেটা: নেকড়ে তো তাকে মারতে পারেনি, মারত ঘায়ে। এই মেয়েটা তার সর্বনাশ করেছে। বউ যে এমন শত্রু হয়, তা তার জানা ছিলনা।

গোবিন্দ হেসে বলল: শত্রুতা আবার কী করল?

শত্রুতা নয়: ছেলেটা জবাব দিল: অন্ধ হয়ে সারাজীবন বাঁচতে হবে। মরে গেলে আমিও বাঁচতাম, এও রক্ষা পেত।

মেয়েটা বলল: কথা শোন বাবু! এই নেমকহারামটার সঙ্গে আমার ঘর করতে হয়।

এদের কথোপকথন শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। চেনা নেই, পরিচয় নেই, অথচ কত সহজে আলাপ হচ্ছে। কোন্ দূর বাংলাদেশ থেকে আমরা এসেছি শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব নিয়ে। এরা অশিক্ষিত পাহাড়ী মানুষ। সমাজের রীতি নীতি আচার ভাষার কত বাধা। তবু কত সহজ। কত সহজে আমরা আত্মীয়ের মতো হয়ে গেলুম। মনে হল, সভ্যতাই একটা বাধা। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ সৃষ্টি

করেছে সভ্যতা। এই পাহাড়ে বনে, নদীতীরে নির্জনে সভ্যতার আলো এসে এখনও পৌঁছয়নি। তাইতেই এরা এত সহজে আত্মীয় হতে পারে। বাঘকে ভয় পায়না, ঘৃণা করে নেকড়েকে। আমাদের সভ্যতাকেও কি এরা নেকড়ের মতো বেইমান মনে করে!

এ কথার উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ বলল: তা কারণবাবার কাছে কেন চলেছ?

এ প্রশ্নের উত্তর মেয়েটার তৈরিই ছিল। বলল: ওর চোখের জন্যে।

কারণবাবা কি চোখের ডাক্তার?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

ওঝা বৈদ্যের এ কাজ নয় বাবু, যদি পারে তো সাধুসন্তেই পারবে।

সেইসঙ্গেই যোগ করল: এই বাবার অসাধ্য কাজ নেই। তেমন করে ধরতে পারলে গতি একটা হবেই। হয়েছেও তো দুপাঁচজনের।

গল্পটা তার পরে বলল: আমাদের গাঁয়েরই তো একটা লোকের চোখ সারালেন। রোগে ভুগে চোখ গেল অন্ধ হয়ে। সেই চোখ বাবা সারালেন।

তাও ভাল যে জন্মান্ধকে দৃষ্টি দেবার গল্প বলেনি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সে গল্প বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। রোগে অন্ধ হবার হয়তো অনেক কারণ আছে। সে বোধহয় সত্যিকারের অন্ধত্ব নয়। কাজেই ওষুধ দিয়ে বা অস্ত্র চালিয়ে ভাল করা সম্ভব। আমাদের সঙ্গে যে লোকটা চলেছে, তার চোখ দুটো নেকড়ে-বাঘে উপড়ে নিয়েছে। কিংবা নষ্ট হয়েছে থাবার ঘায়ে। এ চোখ কি সে ফিরে পাবে! তবু এরা বুক-ভরা বিশ্বাস নিয়ে চলেছে। বিশ্বাসে কী না মেলে!

এবারে আমরা নদীর ধারেই পৌঁছে গেলুম। এই জায়গাতেই

নদী বোধহয় সবচেয়ে সংকীর্ণ। তাইতেই এখানে পুল তৈরি হয়েছে। দুটো গাছ পাশাপাশি ফেলা। এপারকে যোগ করছে ওপারের সঙ্গে। একটা গাছেরও পুল আছে শুনেছি, শুনেছি দড়ির পুলের কথা। তাইতেই এই পুলটা বড় নিরাপদ মনে হল। কিন্তু মেয়েটি ভয় পেল তার স্বামীর জন্য। গোবিন্দর দৃষ্টি বড় সজাগ। বলল: ভয় কী, আমি তো আছি।

বলেই সেই লোকটার একখানা হাত ধরল। মেয়েটা ধরল আর একখানা হাত। অপরিসর নদী। নিরাপদেই আমরা পেরিয়ে গেলুম।

ষোল

কারণবাবার আশ্রম দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল। আশ্রম বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই সেখানে নেই। কোন কুটীর নেই, মালঞ্চ নেই, নেই কোন পোষা পশুপাখী। যা আছে, তা দেখে মন ভরেনা। রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি দুটো গুহা আছে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন দুটি অপ্রশস্ত স্থান। একটির মুখের সামনে বড় একখানা পাথর ঠিক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর একটির মুখ খোলা। কিন্তু ঐ খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠতে হয়। মাথার উপর থেকে গোটাকয়েক নরকপাল ঝুলছে। বীভৎস দৃশ্য। সোজা হয়ে ঢোকবার উপায় নেই। ঐ মুণ্ডগুলোকে এড়াতে হলে গুড়ি মেরে ঢুকতে হবে। ভিতরে একটা ধুনী জ্বলছে মনে হল। গোবিন্দ বলল: বাবার বৈঠকখানা ওটা।

আর এধারেরটা?

শোবার ঘর।

ব্যবস্থা যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। খোলা বৈঠকখানা, কিন্তু পর্দা আছে শোবার ঘরের। পর্দা অতিক্রম করে উঁকি না দিলে ভিতরের জিনিস সহসা চোখে পড়েনা।

গোবিন্দ বলল: ওদিকে যেয়োনা।

শোবার ঘরের দিকে আমি যাচ্ছিলুম না। তবু সে আমাকে সতর্ক করে দিল। আমরা সবাই এলুম বৈঠকখানার সামনে।

ধুনীর আগুনে ভিতরটা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। জনকয়েক লোক মনে হল জটলা করছে। গোবিন্দ এগোতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কয়েক হাত পিছিয়ে এল। বাজ পড়ার মতো একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। তারই

সঙ্গে কী একটা পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে এল। আমরা দুধারে সরে গিয়েছিলুম। গোবিন্দ চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল: বাবা ক্ষেপে গেছেন!

যে পদার্থটি ছিটকে এসেছিল, সে সচল। একটা রুগ্ন মানুষ। গায়ে মুখে কুৎসিত রোগের দাগ। বুঝতে কষ্ট হলনা যে ওকে দেখেই কারণবাবা ক্ষেপে গেছেন। গুহার ভিতর থেকে এক রকমের শব্দ আসছিল! অদ্ভুত গম্ভীর আওয়াজ। কারণবাবা বোধহয় বলছিলেন: ওষুধ নয়, বিষ দেব তোমাকে। কটা মেয়েকে খুন করেছ এ পর্যন্ত?

ভিতরে উত্তর দিচ্ছে অন্য লোক। বলছে: তুমি তো অন্তর্যামী বাবা! দিব্য চোখে তুমি সবই দেখতে পাচ্ছ। তুমি ক্ষমা না করলে—

কথা শেষ করার সুযোগ সে পেলনা। অকথ্য ভাষায় কারণবাবা গালাগালি শুরু করলেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। যে রুগ্ন লোকটা বেরিয়ে এসেছিল, সেও মাথা গুঁজে বসে রইল। দ্বিতীয়বার ভিতরে যাবার সাহস তার হলনা।

কিন্তু ভিতরের মানুষটার সাহস দেখলুম অপরিমিত। নির্ভীকভাবে বলতে লাগল: ত্রিশূলখানা তো বাবা তোমার হাতের নাগালেই আছে। অমন গালাগালি না করে দাওনা আমার পেটটা ফুটো করে। আমিও রক্ষা পাই, তোমাকেও আর জ্বালাতন হতে হয়না।

এ কথার উত্তর কারণবাবা দিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে বললেন: পালা এইবার!

গোবিন্দ উঁকি দিচ্ছিল। বলল: ব্যাটা বেঁচে গেল।

কারণবাবা তাহলে ঐ লোকটার পেটে ত্রিশূল ফোটাননি। আমরাও নিশ্চিন্ত হলুম।

গোবিন্দ বলল ঃ পেয়েছে কিছু।

আমি আস্তে আস্তে বললুম ঃ কী পেয়েছে ?

গোবিন্দ সে কথার উত্তর দিলনা। বলল ঃ প্রণামের ঘটা দেখ। সাষ্টাঙ্গে পড়েছে। এইবারে লাথি খাবে।

লাথি খেল কিনা আমরা দেখতে পেলুমনা। কিন্তু বেরিয়ে এল গড়িয়ে গড়িয়ে। বাহিরের আলোতে এসে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল। তারপরেই সঙ্গীকে ধমক দিল ঃ চল্ হতভাগা !

আমাদেরও সে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কথা কইল সেই পাহাড়ী মেয়েপুরুষ দুটির সঙ্গে। বলল ঃ এই বেলা ঢুকে পড়্, বাবা আজ খুশ মেজাজে আছে।

ভয়ে ভয়ে গোবিন্দকে আমি বললুম ঃ এই তাঁর খুশ মেজাজ ?

গোবিন্দ সহজভাবে উত্তর দিল ঃ হাসতে হাসতে যে মানুষ বলি করতে পারে, তার এটা খুশ মেজাজ নয় ?

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ভিতরে যাবার প্রবৃত্তি আমার হলনা। বললুম ঃ আমি ভাই ফিরে যাই।

গোবিন্দ আমার কথার উত্তর দিলনা। বাহির থেকে হাঁক দিল ঃ বাবা, ভেতরে আসব ?

কারণবাবা এই বাবা সম্বোধনের যা উত্তর দিলেন, তাতে কানে আঙুল দেওয়া উচিত। গোবিন্দ কিন্তু খুশী হয়ে বলল ঃ সত্যিই, বাবার মেজাজটা আজ ভাল আছে।

সেই মেয়েপুরুষ দুটি ইতস্তত করছিল। গোবিন্দ তাদেরও সঙ্গে ডাকল, বলল ঃ চলে এস।

আমাকে ডাকল না। কাঁধে ভার দিয়ে মাথা নিচু করিয়ে ভিতরে ঠেলে দিল। নিজেরাও এল।

বাবার সম্বোধনগুলো অশ্রাব্য। সেইগুলো বাদ দিয়েই শোনা উচিত। বললেন ঃ ব্যাটা এক দঙ্গল পঙ্গপাল নিয়ে এসেছে !

তাড়াতাড়ি গোবিন্দ বলল ঃ আমার এক বন্ধুর কথা বলেছিলুম বাবা।

সেই নাস্তিকটা তো ঃ বাবা উত্তর দিলেন ঃ ওর মতলবটা ভাল নয়।

গোবিন্দ তখন সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রনাম করছিল। ভাবলুম, আমার বদনাম ঘোচাবার জন্য আমিও প্রণিপাত করব কিনা। কেন জানিনা, তা পারলুম না। কারণবাবা বললেন ঃ হবেনা, হবেনা। তোমার দ্বারা এ সব হবেনা।

কথাটা আমার মনে লাগল। আমাকে লক্ষ্য করেই কি বললেন! কিন্তু কিছু প্রশ্ন করবার সাহস হলনা।

গোবিন্দর পর সেই মেয়েটি প্রণাম করল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বামীকে বলল প্রণাম করতে।

কারণবাবা বললেন ঃ এ হতভাগারা আবার কে?

গোবিন্দ বলল ঃ দেশে কি দুঃখীর অভাব আছে বাবা!

কারণবাবা খানিকক্ষণ ধরে গালাগালি করলেন। তারপর বললেন. হতভাগা দেশের দোষে কি এরা আমার কাছে আসবে! এরা আসে নিজের কর্মফলের দোষে। দেখছিসনা ব্যাটা জানোয়ারকে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল।

মেয়েটা আর্তনাদ করে বাবার পা জড়িয়ে ধরল, বলল ঃ ঠিক বলেছ বাবা। হালচাল এর মানুষের মতো নয়।

এই আর্তনাদের সঙ্গে আমি শিশুর কান্না শুনতে পেলুম। এতক্ষণ যে পদার্থটি জড় মনে হয়েছিল, সে প্রাণবন্ত জেনে আশ্চর্য লাগল। শিশু কি এতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে! কারণবাবা ভেংচি কাটলেন। বললেন ঃ কাচ্চা-বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে! হতভাগা!

তারপরেই হাঁক দিলেন ঃ গোবিন্দ!

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

একটা বোতল এগিয়ে দে তো।

লক্ষ্য করে দেখলুম যে অনেক কটা বোতল রাখা আছে। আরও কয়েকটা বোতল বেরল সেই মেয়েটির ঝুলি থেকে। বোতলের নামে বুঝি তার নিজের ঝুলিটার কথা মনে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল : আমি এনেছি বাবা!

বাবা আর এক দফা গালাগালি করলেন। বললেন : বোতল আনলেই ব্যবস্থা হবে, না ? চোখ কখনও ফিরে পাওয়া যায়!

শিশুর কান্না থামেনি। তাকে সামলাতে সামলাতে কাতর স্বরে মেয়েটি বলল : তোমার দয়া হলে সব হয় বাবা!

কারণবাবা এ কথার উত্তর দিলেন না। বললেন : আজ রাতে চক্রের ব্যবস্থা কর্।

মেয়েটির চোখে মুখে দেখলুম আনন্দের লালিমা ফুটে উঠল। বোধহয় ভাবল, তারই জন্য এই ব্যবস্থা হচ্ছে। বলে উঠল : কর বাবা, আজ রাতেই ব্যবস্থা কর!

কারণবাবা একেবারে ফেটে উঠলেন। বললেন : হ্যাঁ, তোমার জন্যেই সব করছি!

তারপরেই করলেন অজস্র অশ্রাব্য গালাগালি।

ছোট ছেলেটার কান্না থেমে এসেছিল। আবার সে ভেঙে পড়ল। মেয়েটি ততক্ষণে তার ছেলেকে পিঠ থেকে কোলে নামিয়ে নিয়েছে। পিছন ফিরে বসে ছেলের কান্না বন্ধ করল অতর্কিতে। ছেলেটা অঁ-অঁ করেই চুপ হয়ে গেল।

গোবিন্দ মধ্যস্থ হয়ে বলল : দুঃখী লোক বাবা!

বাবার গালাগলি থামল। বললেন : দুঃখী বলেই পাগল হতে হবে! কানা চোখ কেউ সারাতে পারে ?

মেয়েটি এতটুকু ভয় পায়নি, বিচলিত হয়নি এতটুকু। বলল :

তুমি সব পার বাবা! অন্য মানুষের চোখ দিয়েছ, প্রাণও দিয়েছ। আর আমার বেলায় খারাপ চোখটা ভাল করতে পারবেনা!

আমি তো ধন্বন্তরি ঃ কারণবাবা একটা বিকট ভেংচি কাটলেন ঃ চিমটেটা আন্, চোখটা ভাল করে দিই।

চিমটেটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ছিল। মেয়েটা নিজেই এগিয়ে যাবার ভঙ্গি করে বলল ঃ ওর কানা চোখ তুলে কী করবে, আমার চোখ জোড়া উপড়ে দাও।

এই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার আশ্চর্য লাগছিল। এমন সপ্রতিভ মেয়ে আমি অনেক দিন দেখিনি। কোন দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। সহজ ভাবে নিজের দাবি জানাতে এসেছে। জানিয়েছেও। মনে হল, কারণবাবাও ঠিক এমন মেয়ের সাক্ষাৎ আগে কখনও পাননি। তাইতেই হাঁক দিলেন ঃ গোবিন্দ!

গোবিন্দ এগিয়ে গেল।

বাবা বললেন ঃ কাল তোমায় চক্রে বসতে বলেছিলাম, তাই না?

গোবিন্দ মাথা নাড়ল।

বাবা বললেন ঃ আজ এই মেয়েটাকে নিয়ে ব'সো।

গোবিন্দ ভাল ছেলের মতো বলল ঃ যে আজ্ঞে।

কেন জানিনা আমার মনে হল, এই মেয়েটা শুধু নিজের প্রয়োজনেই আসেনি, এসেছে চক্রেরও প্রয়োজনে। তান্ত্রিক চক্র কি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে! গতকাল কারণবাবা চক্রের জন্য একটি মেয়ের প্রয়োজন আছে মনে করেছিলেন। সেই মেয়ে এসেছে নিজে থেকে। আর একটা মেয়ে—

সোমার কথা আমার মনে পড়ল। কই, তাকে তো দেখতে পাচ্ছিনে! এই পরিবেশে তার কী আকর্ষণ! তাকেও কি এদের চক্র চুম্বকের মতো টানছে! চেষ্টা করেও কি সে এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনা?

কারণবাবা গোবিন্দকে বললেন : এই নাস্তিকটাকে বিদেয় কর।

নাস্তিক যে আমাকে বললেন তাতে সন্দেহ নেই। আর একবার তিনি আমাকে এই কথা বলেছেন। আমি বসব ভাবছিলুম। কিন্তু এই অভিযোগ শুনে আর বসলুম না। গোবিন্দকে বললুম : আমি তাহলে চলি।

গোবিন্দ আমাকে অনুমতি দিলনা, কারণবাবাকে বলল : ও এসেছিল তন্ত্রের আলোচনা শুনতে।

কারণবাবা অকথ্য ভাষায় তার উত্তর দিলেন। গোবিন্দকে বড় অসহায় দেখাল। তার মুখ চেয়েই আমি চুপ করে বেরিয়ে এলুম। কোন কথার উত্তর দিলুম না। গোবিন্দ একবার আমার আর একবার কারণবাবার মুখের দিকে চেয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সতেরো

গুহার ভিতর থেকে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসবার সময় ভাবিনি যে বাহিরে এসে সৌভাগ্যের সন্ধান পাব। সোমা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই হেসে উঠল উচ্ছল আবেগে। শব্দহীন হাসি। আমি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলুম যে সে হাসিতে শব্দ ছিল না। সোমা বলল: ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছ তো?

সংক্ষেপে উত্তর দিলুম: না।

না মানে?

তাড়িয়ে দিলেন।

হাসতে হাসতেই সোমা বলল: সবাইকেই তো তাড়িয়ে দেন। কিন্তু কেউ যায়না।

সোমার কাঁকালে ছিল কলসী। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বেলা পড়ে এসেছে। জলকে চলার সময়। জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় যাচ্ছ?

উত্তর না দিয়ে, সোমা তার কাঁকালের কলসীটা দেখাল। সমস্ত শরীরটা উঠল দুলে। বেহায়ার মতো আমি তাকে খুব ভাল করে দেখলুম। নির্লজ্জের মতো। কিন্তু সোমা লজ্জা পেল। কলসীর নিচে থেকে শাড়ির আঁচলটা আরও বেশি করে টেনে নিল। আরও ঘন করে দেহটাকে ঢাকবার চেষ্টা।

আমি তোমার সঙ্গে যাব?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

সোমার আপত্তি করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করলনা। সঙ্গে

যাবার অনুমতিও দিলনা। ঘাড়টা একটু কাৎ করে তরতর করে এগিয়ে গেল।

আমার মনে হল, সোমা আমাকে ডেকেই গেল। আমি আর অপেক্ষা করলুম না। তারই পিছনে এগিয়ে গেলুম।

সোমা সেই নদীর পুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধরে ফেললুম। বললুমঃ নদীর এপারে কি জলের ঘাট নেই?

কেন থাকবেনা!—

তবে যে ওপারে যাচ্ছ?

ইচ্ছে।

ভারি বেয়াড়া ইচ্ছে তো! এতখানি পথ জল বইতে তোমার কষ্ট হয়না?

যদি বলি, আনন্দ পাই?

তাও বিচিত্র নয়। সারাদিন হয়তো খাঁচার পাখির মতো বন্দী হয়ে থাকে। এই জলকে চলার নামে খানিকক্ষণের মুক্তি। বললুমঃ আমি নিশ্চয়ই আনন্দ পাব।

সোমা একটা কটাক্ষ হানল।

আমার ভাল লাগল।

ওই মেয়েটা কে?

সোমা জানতে চাইল পিছন ফিরে।

বললুমঃ দুঃখী মেয়ে।

পিঠে ওর ছেলে বুঝি? ওর নিজের ছেলে?

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

সোমা বোধহয় আমার হাসি দেখতে পায়নি। বললঃ ভারি সুন্দর ছেলেটা, তাই না?

তুমি দেখলে কী করে?

লুকিয়ে দেখেছি। ফরসা ফুলো ফুলো গাল, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, পিটপিট করে চাইছিল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আমি সোমার দিকে তাকালুম। মনে হল, সে এখনও ঐ ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছে। তার সমস্ত মন এখন একটি শিশুর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কথা বলে আমি তার আবেশ নষ্ট করলুমনা।

একখানা পাথরের উপর বেকায়দা পা পড়তেই তার স্বপ্নভঙ্গ হল। আমি তার পাশে পাশে চলছিলুম। একসময় প্রশ্ন করল : তোমার ভয় করেনা ?

কিসের ভয় ?

এই যে আমার পাশে পাশে চলেছ, বুড়ো দেখতে পেলে তোমার মুণ্ডপাত করবে।

গালাগালির ভয় আমি পাইনে। গালাগালি ছোটলোকে করে।

বড়লোকে বেশি করে।

যারা করে তারা ধনী হতে পারে, কিন্তু বড়লোক নয়। মেজাজে মানুষ বড়লোক হয়, টাকায় নয়।

সোমা আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, এ কথা তার বিশ্বাস হল না। বললুম : কেন, ঠিক বলিনি ?

সোমা আমার উত্তর দিলনা। বলল : তাহলে গরিব কারা ?

হেসে বললুম : যারা কিছু নেই ভাবে, তারাই গরিব।

যাদের সত্যি কিছু নেই ?

মন মেজাজ সকলেরই আছে। নিজেকে রাজা ভাবতে বাধা কিসের !

তাতে তো পেট ভরবেনা।

সোমা উত্তর দিল দুঃখিত চিত্তে।

সহসা এ কথার উত্তর আমি খুঁজে পেলুমনা। পেট এমন জিনিস

যেখানে কোন ফাঁকি চলেনা। কথায় বক্তৃতায় পেট ভরেনা, শাস্ত্রালোচনায় ভরেনা, যোগাভ্যাসেও বোধহয় ভরেনা। শুধু মাত্র খাদ্য দিয়ে পেট ভরে। আজকের বিজ্ঞান গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু বিনা খাদ্যে পেট ভরাবার ব্যবস্থার কথা ভাবছেনা। উপায় থাকলে হয়তো ভাবত। তবু আমি সোমাকে একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করলুম। বললুমঃ ক্ষিধের কথা ভুলতে পারবে।

সোমা উত্তর দিতে দেরি করলনা, বললঃ ক্ষিধে পেলে আমার সব ভুল হয়ে যায়।

কাঠের পুলটা আমি সাবধানে পার হলুম। কিন্তু সোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হলনা যে সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে। কাঠ আর মাটি বুঝি তার কাছে একই জিনিস। পায়ের নিচে কিছু থাকলেই হল। না থাকলেও বোধহয় কিছু ক্ষতি নেই। পুলের শেষটুকু সে লাফিয়ে লাফিয়েই পেরিয়ে গেল।

পিছন থেকে ডেকে বললুমঃ তোমার সঙ্গে আমি ছুটতে পারিনে।

সোমা হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে নদীর তীর হল খুশিতে মুখর। আমার মনে পড়ল, কারণবাবার গুহার সামনেও সোমা হেসে উঠেছিল। কিন্তু সে হাসিতে শব্দ ছিলনা। সোমা পিছন ফিরে তার বাঁ হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে বললঃ চলে এস।

তার ফরসা হাতখানা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলুম। খিলখিল করে হেসে সোমা হাতখানা টেনে নিল।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। তারপরেই মনে হল, লজ্জা পাওয়া তো উচিত নয়। যুগে যুগে নারী এমনি করেই তো পুরুষকে ডাকে, আকর্ষণ করে। হেসে হাত বাড়িয়ে দেয়। তারপর হাত টেনে নেয়। না নিলে আরও বিপদ। তাতে হাত পুড়বে, কপালও পুড়বে। আর

জ্বলবে মন। নারী বুঝি দূর থেকে দেখবার জিনিস। সম্মান করবার, উপভোগ করবার। ভোগ করবার নয়। আমিও নিজের হাতখানা গুটিয়ে নিলুম। সোমার হাসি তখনও থামেনি।

একটু উষ্মার ভাব মিলিয়ে বললুম : বুড়োকে বুঝি এমনি করে ভোলাও ?

উত্তর দিতে সোমা একটুও দেরি করল না। বলল : বুড়ো এমনিতেই ভুলে আছে।

আর গোবিন্দ ?

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখখানি দেখছিলুম। বেলাশেষের রশ্মি পড়েছে তার গৌর গালে। টুকটুকে রঙ আরও লাল দেখাচ্ছে। মনে হল, আরও এক ঝলক রঙ লাগল। রক্তের রঙ। একটা কটাক্ষে ভৎর্সনা জানিয়ে মেয়েটা মুখ ফেরাল। আমি জানি, সোমা রাগ করেনি।

কলসী নিয়ে সোমা নদীর জলে নামলনা। একখানা পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়াল। বললুম : বসবে এইখানটায় ?

সোমা বলল : তুমি লোক সুবিধের নও।

সুবিধের হলে আর তোমার সঙ্গে আসব কেন !

মানে ?

মানে, ভাল লোক হলে ঐ বুড়োর পায়ের তলাতেই পড়ে থাকতুম। তোমার পেছনে এত দূর আসতুম না।

তুমি তো উল্টো রাস্তায় আসনি। নিজের আস্তানার দিকেই যাচ্ছ।

গম্ভীর ভাবে বললুম : তুমি উল্টো দিকে গেলে আমিও সেদিকেই যেতুম।

আমার কথা শুনে সোমা বোধহয় বিস্মিত হল, কিন্তু ভয় পেলনা। বলল : বেশ লোক তো !

বেশ লোক কেন ?

নিজেকে কি কেউ খারাপ বলে !

লোক সুবিধের নই বলেই সব কথা স্বীকার করি। ভাল হলে চেষ্টা করতুম, লোকে যাতে আরও ভাল বলে। মানে, ভণ্ড সাজতুম।

তোমার মতে তাহলে ভাল লোকেরা সব ভণ্ড ?

সব না হলেও বেশির ভাগ তো বটে। এই তোমার কথাই দেখনা !· ঐ বুড়োটার সঙ্গে তুমি ভণ্ডামি করছনা !

কী রকম ?

বললুম ঃ তোমার যা বয়স, তাতে তোমার ঘর করা উচিত আমাদের মতো একটা জোয়ানের সঙ্গে। তা নয়, একটা মাতাল বুড়োর সঙ্গে জীবনটা নষ্ট করছ !

যৌবনটাও বলতে পারতুম, কিন্তু মুখে আটকে গেল। এতটা হয়তো নিজের দেশে নিজেদের জানাশুনো কোন মেয়েকে বলতে পারতুম না। পাহাড়ী দেশে বনের ভিতর মূর্খ মেয়ে বলেই পারলুম। অসভ্য সমাজে ভণ্ড সাজবার কোন প্রয়োজন হয় না।

সোমাকে আমি বিভ্রান্ত হতে দেখলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ তুমিও এই কথা বলছ ?

আর কে বলেছে ?

সোমা সে কথার উত্তর দিলনা। বলল ঃ নিজের চোখে না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না।

কী দেখতে হবে বল ?

সোমার দৃষ্টিতে আমি আচ্ছন্নতা দেখলুম। সে বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম ঃ বল।

ধীরে ধীরে সোমা বলল ঃ তুমি বুঝবেনা।

কেন বুঝবনা ! তুমি বললেই আমি বুঝতে পারব।

সোমা খানিকক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল ঃ আমাকে তো

মানুষের মতো দেখেনা, সে আমাকে পূজো করে। আমার মধ্যে সে ভগবতীকে দেখে।

এ সব কথা আমার শোনা আছে। তার পরের কথাটুকুও শোনা। ভগবতী ভক্তির জিনিস, ভোগের নয়। তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ, দেহের নয়। লতা-সাধনের দার্শনিক তত্ত্ব আমার জানা নেই। তবু আমি দেখতে পেলুম, এই মেয়েটা কিছু বুঝেছে, কিছু পেয়েছে। একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। আগের মুহূর্তে যে নিজেকে ভগবতী ভাবল, পরের মুহূর্তে সে কী করে ধরা দেয় মানুষের কাছে! মানুষের কামনা কি দেবতাকেও ছুঁতে পারে?

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সোমা তার সুযোগ দিলনা। সে জেগে গেছে। পাশ থেকে কলসীটা কুড়িয়ে নিয়েই লাফিয়ে উঠল। বলল: চললাম।

বাধা দেবার চেষ্টা করে বললুম: আর একটু বসবেনা?

সোমা তখন জলের কাছে নেমে গেছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জল ভরতে ভরতে বলল: না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। সেই চটুল মেয়েটি। তার জল ভরা কলসী কাঁকালে নিয়ে পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল: তোমার বন্ধুও আজ চক্রে বসবে। দেখতে এস।

আমি কোন উত্তর দিতে ভুলে গেলুম।

আঠারো

ক্যাম্পে ফিরতে আমার মন আজ সরল না। সোমা চলে যাবার পরেও আমি সেই পাথরখানার উপর বসে রইলুম।

দৃষ্টি এখানে সীমিত। পিছনে ঘন অরণ্য দক্ষিণে ও বামে সুদূর প্রসারিত, সম্মুখে শ্যামল পর্বত তরঙ্গায়িত হয়ে দিগন্তকে অবরুদ্ধ করেছে। মাঝখানে কলোচ্ছলা কালীর দুরন্ত নৃত্য। সায়াহ্নের অন্ধকারে এখনও সব কিছু আবৃত হয়নি। চীর গাছগুলো স্থির হয়ে আছে, নড়ছে ঝাউএর পাতা। ছোট ছোট সবুজ চামরগুলো একই সঙ্গে একদিকে হেলে পড়ছে। কান পেতে তার শব্দ শোনা যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো।

মনে হল, কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠে চারিদিকে চাইলুম। কে হাসল! কাছে-পিঠে কেউ তো কোথাও নেই! এই নির্জন স্থানে কে আমাকে উপহাস করবে! হঠাৎ দেখতে পেলুম, জলস্রোতের সঙ্গে কয়েকটা নুড়ি একটা বড় পাথরের উপর আছড়ে পড়ল। এক রকমের অদ্ভুত শব্দ উঠল। কোন মায়াবী মেয়ের হাসির মতো।

আজ সোমা কয়েকবার এমনি করে হেসেছিল। ঠিক এমনি উপহাসের মতো বেহায়া ভঙ্গিতে। নদীটা কি আমাকে উপহাস করছে! কিন্তু কেন তা করবে? আমি তো তেমন কিছু বোকামির কাজ করিনি!

করেছ।

সেকি! চমকে আমি ঘাড় ফেরালুম। পিছন থেকে কে কথা বলল শুকনো গলায়! না না, ও নিশ্চয়ই মানুষের গলা নয়।

গোটাকয়েক শুকনো পাতা পড়েছে চীর গাছের। এই নির্জন স্থানে মানুষ কোথা থেকে আসবে!

ঝাউএর চামরগুলো আবার একদিকে হেলে পড়ল। শব্দ উঠল সোঁ সোঁ করে। ওরাও কি কিছু বলছে!

হঠাৎ কয়েকটা বাদামের খোলার মতন জিনিস আমার কোলের উপর এসে পড়ল। ওরা যেন ভাব করতে এসেছে। হাতে করে কুড়িয়ে দেখলুম, ও ঝাউএর পাকা ফল। বাতাসে ফেটে গিয়ে নিচে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার কোলে না পড়ে নরম মাটিতে পড়লে ঐ ফলের বীজ থেকে নতুন চারা হত। নতুন গাছ। বনের ভিতর গাছ কেউ লাগায়না। গাছেরা নিজেরাই গাছ লাগায়। নিজেরাই ছায়া বিস্তার করে শিশু গাছকে রোদ ঝড় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মাটি থেকে রস টেনে বেঁচে থাকতে শেখায়, বাতাস থেকেও খেতে শেখায়। গাছ এখানে একা থাকেনা, বনে এরা সমাজ গড়ে আছে। নানা রকমের গাছ। কারও নাম আমরা জানি, গুণ জানি। কারও কিছুই জানিনা। ওদের তাতে কিছুই যায় আসেনা। পাশপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরে ভাব করে থাকে। মানুষের মতো নির্জনে থাকতে ওরা ভালবাসেনা। আমাকে একা দেখে আমার সঙ্গেও ভাব করতে চাইছে। নদীটাও ওদের কথা বোঝে। বোধহয় ওদের একই ভাষা। সারাক্ষণ কথা কয়। কথা শোনায়।

আর ঐ বুড়ো পাহাড়টা! ও বড় বেশি গম্ভীর। সহসা কথা কয় না। শুধু এদের কথা শোনে। আজ বুঝি আমার কথা শুনছে।

সোমাকে ওরা সবাই দেখেছে। ও মেয়েটা আমাকে ফেলে নাচতে নাচতে চলে গেছে। এই বুড়ো পাহাড়, এই নদী, এই লম্বা গাছগুলো কি সোমার এই কাজ সমর্থন করতে পেরেছে! নিশ্চয়ই পারেনি। তবে নদীটা কেন হেসে উঠল! আর তাকে সমর্থন করল চীর গাছের পাতাগুলো! ঐ মেয়েটার কথা ভাবছিলুম বলে

কি তারা আমায় বোকা ভাবছে! বিচিত্র নয়। বোকারাই তো মেয়েদের কথা ভাবে।

কোথা থেকে খানিকটা বাতাস এল। শুকনো পাতার উপর উঠল মর্মর ধ্বনি। মনে হল, এই বুনো সমাজটা একযোগে সমর্থন করছে নদীর হাসিকে আর চীর পাতার মন্তব্যকে। এদের ভিতর মতান্তর নেই। নিজেরা তো একাত্মাই, তেমন মানুষ পেলে তারও সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।

মন বলল, পালিয়ে যাই। এই পাহাড়, এই নদী, এই বন, এরা সবাই আমাকে চিনে ফেলেছে। এদের কাছে মুখ দেখাবার আর আমার উপায় নেই। আমাকে পালিয়ে গিয়েই মান বাঁচাতে হবে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পা চালিয়ে দিলুম।

পায়ের তলায় ঝাউএর একটা বীজ মর্মরিয়ে গুঁড়িয়ে গেল। আমি চমকে উঠেছিলুম। মনে হল, বিশ্রী শব্দ করে কারা সব হেসে উঠল। ভয়ে ভয়ে আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

কিন্তু কেন ওরা হাসল? আমি পালিয়ে যাচ্ছি দেখে! না ভাবল, আমি আবার ঐ মেয়েটার কাছেই যাব! সোমা আমায় সত্যিই যেতে বলেছে। গোবিন্দ আজ চক্রে বসবে। সেও বসবে। আর সেই মেয়েটা! অন্ধ স্বামীর জন্য তাকেও আজ বসতে হবে। কিন্তু ছেলেটাকে কার কাছে রাখবে? সোমা যে চক্রে বসবে, কিন্তু সঙ্গী হবে কার? কারণবাবার, না গোবিন্দর! কারণবাবার সঙ্গী তো সে রোজই হয়। বুড়ো কি আজ নতুন মেয়েটাকে নিজে নিতে চাইবে না? গোবিন্দর কপাল তাহলে ফিরে যাবে। সোমাকে পাশে নিয়ে বসবে, কালী রূপে তার পুজো করবে। কপালে সিঁতুর মেখে হাতে তুলে নেবে নারকেলের পানপাত্র। মন্ত্র পড়ে কারণ শোধন করবে। তারপর সেই শোধন-করা সুরাপান। তুএক পাত্র নয়, পর পর পাঁচ পাত্র। যতক্ষণ দৃষ্টি ও মন চঞ্চল না হয়, ততক্ষণ পান। তারপর

চক্রীদের কল্যাণ ও তাদের বিপক্ষের বিনাশের জন্য শান্তিস্তোত্র পাঠ। আনন্দোল্লাস করবে আনন্দস্তোত্র পাঠের পর। হাঁটতে হাঁটতেই আমি বুঝতে পাচ্ছিলুম যে কপালে আমার ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি ঘেমে উঠেছি।

কিন্তু এ আমি কোন্ পথে চলেছি! এ তো আমার ক্যাম্পে ফিরবার পথ নয়! এ পথে গেলে যে আমি কারণবাবার গুহাতেই পৌঁছে যাব! আমার পা কেন আজ এদিকে যাচ্ছে! আমি নিজের পায়ের দিকে তাকালুম। এ তো আমারই পা! কিন্তু আমার আদেশের অপেক্ষা যেন আজ করছেনা। ওদের কি কেউ টানছে!

দেওয়ালের উপর থেকে টিকটিকি উত্তর দিলনা ঠিক-ঠিক। এখানে ইটের দেওয়াল নেই। টিকটিকিও নেই দেওয়ালের উপর। এখানে শুধু সারি সারি গাছ। গাছে টিকটিকি আছে কিনা জানিনা, ঝিঁঝি পোকার অভাব নেই। ওদের ডাক একবার শুরু হলে সারারাত ধরে চলবে। গোবিন্দদের চক্রও কি আজ সারারাত চলবে!

সেই কানা লোকটা আজ কী করবে! তাকে তো চক্রে বসতে দেবেনা! সে এ সবের জানেই বা কী! জানলে কি তার বউকে বসতে দিত!

বনের গাছগুলো আজ বড় গম্ভীর হয়ে আছে। হেলছেনা দুলছেনা, কোন সাড়া শব্দই দিচ্ছেনা। তারা কি সব মরে আছে, না আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে! কিসের আতঙ্ক! আমার জন্য! আমি কি কোন বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি! বোধহয় যাচ্ছি। তা না হলে এরা এমন মুখ গুমরে চুপ করে থাকবে কেন!

তবে কি আমার ফেরা উচিত! একি, পথের উপর এত বাধা কেন! একটা দুটো তিনটে—আরও একটা—ঐ তো আর একটা। পথের উপর আড়াআড়ি ওরা পড়ে আছে। ওরা চায়না আমি ঐ

বাধা ডিঙিয়ে যাই। ওগুলো কী! উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বড় বড় গাছের পিছনে এখনও কিছু আলো আছে। ছায়া ঘনিয়েছে নিচে। আবছায়া পথের উপর কালো কালো ছায়া পড়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। তবু আমি থামতে পারলুম না। ছায়াগুলো ডিঙিয়ে গেলুম।

একবার মনে হয়েছিল, গাছেরা বোধহয় পথের উপর সরে আসবে। হাত বাড়িয়ে বলবে, ওদিকে যেয়োনা, ও তোমার পথ নয়। হাত জোড় করে আমি বলব, পথ ছাড়ো, যেতে আমাকে হবেই, আমাকে যে টানছে, আমি থাকতে পারছিনা, ফিরতে পারছিনা। ওরা বলবে, কেন পারবেনা, আমরা তোমাকে ধরে রাখব, তুমিও তো আমাদেরই একজন।

সত্যিই তো। আমিও তো ওদেরই একজন। আমাদের মস্ত বড় সমাজ। উপরে আকাশ আর নিচে মাটি। চারিদিকের দিগন্ত দিয়ে ঘেরা এই বিরাট বিশ্বটাই তো আমাদের সমাজ। আমরা চাইনা বলেই অন্যের কথা আমরা বুঝিনা, শুনিনা। অন্যের আগ্রহও আমরা দেখতে পাইনা। আজ নিঃসঙ্গ হয়ে সবই দেখতে পাচ্ছি।

এমন অন্যমনস্কভাবে আমি কাঠের পুলটা পার হতে পারলুম না। সেই সংকীর্ণ পুলের সামনে এসে মনে হল, এও বুঝি একটা ছায়া! কিন্তু আড়াআড়ি নয়। এরা বেশ পথ ছেড়ে দিল! যেন হাতছানি দিল এগিয়ে যেতে! আমি দাঁড়িয়েছিলুম। পুলের উপর পা দেবার আগে ভাল করে অনুভব করলুম এই পরিবেশটা। তারপর সবই সরল হয়ে গেল। আমি একটা পাগল, পাগলের মতো সব আবোল তাবোল ভাবছি।

বেশ সন্তর্পণে পুলটা পার হলুম। সরু সরু দুটো গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে একটা দুরন্ত নদী পার হতে সতর্ক হওয়া উচিত বৈকি। পা হড়কে পড়ে গেলে বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। নদী

অনেক নিচে। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে বেহিসেবী ভাবে। নদীর স্রোতও প্রখর। পাথর বা নদী তুইই মারাত্মক। দৃষ্টিকে তাই পথের উপর সংহত করে পুলটা পেরিয়ে এলুম।

অন্ধকার বেশ ঘনিয়েছে। কিন্তু আমি একজন মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সে নদীর ধারে একটা পাথরের উপর বসে আছে। একেবারে একা। ভাল করে লক্ষ্য করেই তাকে চিনতে পারলুম। সেই অন্ধ যুবকটি। আমার কী মনে হল জানিনে, আমি এসে তার পাশে বসলুম।

লোকটা চমকে উঠেছিল। দেখতে পেয়ে আমি নিজের পরিচয় দিলুম। বললুম : একা একা কী করছ ?

লোকটা হাত দিয়ে আমার দেহটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল : আমার কাছে আর কে থাকবে বাবু ?

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাড়াতাড়ি আমি বললুম : কেন, আমি তো তোমার কাছে থাকব বলে এলুম।

তুমি ওদের সঙ্গে পূজোয় বসবেনা ?

না।

লোকটার এ কথা বিশ্বাস হল না। বলল : আমি যে শুনলুম—

বললুম : ঠিকই শুনেছ। যে বসবে তার নাম গোবিন্দ। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

অনেকক্ষণ লোকটা কথা কইলনা। তারপর বলল : আমার বউটা তো বাবু মূর্খ মেয়ে, ও কী পূজো করবে !

তন্ত্রমন্ত্রের সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকলে আমারও নিশ্চয়ই এ কথা মনে হত। কিন্তু এই অন্ধ মানুষটিকে কিছু সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন আছে। বললুম : ওকেই তো বাবা পূজো করবে। চোখ বন্ধ করে তোমার বউকে ভাববে মা কালী।

অন্ধকারেও আমি পাশের মানুষটাকে চমকে উঠতে দেখলুম।

আর্তনাদের মতো অসহায় সুরে বলে উঠল : ছি ছি, ও যে আমার বউ। আমি তো ওর কোন সম্মান রাখিনে।

মানুষ কি কখন অপবিত্র হয় : আমি তাকে সান্ত্বনা দিলুম : অনুতাপের আগুনে পুড়লে পাপও সোনা হয়ে যায়। তোমরা তো পাপ করনি।

এ কথা বোধহয় লোকটার বিশ্বাস হল না। চুপ করে শুনে গেল, কোন উত্তর দিলনা।

একসময় বলল : আমাকে ওরা এইখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে বলল : ওরা কী করছে, তুমি দেখে আসবে বাবু ?

বললুম : আসব।

উঠে দাঁড়াবার পরে দেখলুম, লোকটা হাত দিয়ে আমার শূন্য স্থানটা দেখছে। আমাকে না দেখে কিছু তৃপ্তি পেল বলে মনে হল। বলল : আমি তোমার অপেক্ষা করব।

উনিশ

কারণবাবার গুহায় ঢোকবার সাহস আমার ছিলনা। ভয় কারণ-বাবাকে নয়। ভয় সভ্যতার। সন্ধ্যাবেলাতেই হয়তো তাঁরা চক্র করে বসেছেন। কিংবা লতা-সাধন। অঙ্গপূজার পদ্ধতির কথাও আমি গোবিন্দর কাছে শুনেছি। নারীর অঙ্গপূজা দেখবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কৌতূহল গোবিন্দর জন্য। শুধু কৌতূহল নয়, দুশ্চিন্তাও। সে যেন আরও বেশি এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে।

একদা সে তার অবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করে। মনুসংহিতা ও বৈদিক পূজাবিধির পর তন্ত্রশাস্ত্র। অনেক পড়াশুনো করবার পর বলেছিল, দুর্বলতার জন্যই মানুষ এ সব মানে। জীবনে তো দুর্দশার অন্ত নেই। তখন খানিকটা শান্তি পাওয়া যায়।

এ কথাটা মিথ্যা নয়। বিপদে পড়ে আমি গনৎকারের কাছে দৌড়তে দেখেছি। তার চোখের সামনে নিজের হাত দুখানা মেলে ধরেছে। শনির স্থান কেন নিচু, একখানা রক্তমুখী নীলা ধারণ কর। কিংবা নিয়ে গেছে নিজের ছকখানা। অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী গণনা করে জ্যোতিষী স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। অবস্থা আরও খারাপ হলে ভৃগুর অন্বেষণ। এতো এ দেশের চরিত্রের দুর্বলতা। এ দেশে যে মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

এ তো হল এক তরফা বিচার। নাস্তিকের বিচার। ভগবানে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এ তো তাঁদের যুক্তি নয়। এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা

ভগবানকে অস্বীকার করতে পারে বুদ্ধির অহংকারে। এক সময় তারা অনেক জিনিসই অস্বীকার করত। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্বাসের পরিধিও তত বাড়ছে! এমন দিন কি আসবেনা, যেদিন ভগবানকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারব বৈজ্ঞানিক সত্য বলে! কোন বৈজ্ঞানিক কি এ কথা ভাবছেন না! কোন মানুষ কি সেদিনের অপেক্ষা করে বসে নেই!

জমি-মাপা সারভেয়ার হয়েও গোবিন্দর প্রকৃতি কিছু কবির মতো আর বৈজ্ঞানিকের মতো কঠিন দৃষ্টিভঙ্গী। আপাতদৃষ্টিতে এ দুটোকে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। কিন্তু তার চরিত্রে কোন বিরোধ দেখিনি। ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন বিরাট শক্তি নেই, কিন্তু পৃথিবী আছে রূপ-রস-গন্ধে ভরা। প্রত্যক্ষ বস্তুকেই তো আমরা কল্পনা করি। বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্যের কেন বিরোধ থাকবে!

আজ কদিন আমি গোবিন্দর আচরণে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা। তার ব্যবহার কেমন এলোমেলো। যে শাস্ত্রে তার বিশ্বাস নেই, তাই নিয়ে কেন এমন মেতে উঠেছে! তন্ত্রকে সে কি আরও ভাল করে নিতে চায়, না এর পিছনে কোন মোহ আছে! তন্ত্র-সাধনায় অনেক প্রলোভন! ব্রহ্মজ্ঞান তো পরের কথা, তার আগে আছে পঞ্চ ম-কার। আছে সোমা। মেয়েটা সত্যিই সুন্দর।

কারণবাবার পাশের গুহায় আমি ঢুকিনি। বাইরে থেকেই শুধু দেখেছি। সেটা কি সোমার অন্তঃপুর! সে একা থাকে সেখানে! কেন জানিনা আমার ইচ্ছা হল সোমার অন্তঃপুর দেখবার। সভ্য মানুষের এমন বাসনা হওয়া উচিত নয়। সভ্যতার রাশ টেনে অন্যায় বাসনাকে সংযত করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তত্ত্বকথা আমি ভুলে গেলুম। মনে হল, এই পরিবেশের ভিতর সভ্য সমাজের রীতিনীতি ভুলে গেলে কোন পাপ হবে না। এই তো পৃথিবীর আদিম পরিবেশ। মানুষে মানুষে এখানে আদিম রীতিতে দেখা হতে পারে।

সতর্ক পায়ে আমি কারণবাবার গুহাটা পেরিয়ে অন্য গুহার সামনে এলুম। সামনের পাথরটা পেরিয়ে ভিতরে আর কিছু দেখতে পেলুমনা। বদ্ধ অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে আমার নিঃশ্বাস রোধ হয়ে এল। মনে হল, আমি মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়েছি। এই গুহায় একাধিক জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম।

বড় পাথরটার কথা আমার মনে ছিলনা। ধাক্কা খেয়ে আমি ছিটকে পড়লুম। অন্য ভিতর থেকে হুঙ্কার উঠল। কারণবাবার গলা আমি অনুমান করতে পারলুম। কিন্তু উত্তর দেবার সাহস হলনা। কোন-রকমে উঠে দাঁড়িয়েই অন্ধকারে আত্মগোপন করলুম।

কারণবাবার গুহার ভিতর আলো জ্বলছিল। বোধহয় তাঁর ধুনির আলো। সেই আলোতে আমি একটি মূর্তি দেখতে পেলুম, গুহার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। মরা মানুষের মুণ্ডগুলির মাঝখানে লোকটাকে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। কারণবাবা এত বীভৎস!

গুহার বাহিরে এসে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাঁক দিলেন: গোবিন্দ!

অস্পষ্টভাবে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছিলেন না। সরু সরু পা দুখানা তাঁর রীতিমতো টলছিল।

গোবিন্দর সাড়া আর আমি পেলুমনা। কিন্তু কারণবাবার গলা শুনতে পেলুম: বুঝেছি।

বলে পাশের গুহার দিকে ঢুকে পড়লেন থপথপ করে। দূর থেকে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা দুর্যোগের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

এবারে আমি গোবিন্দকে দেখতে পেলুম উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে

আসতে। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা সে খেলনা। বেরিয়ে এসেই নদীর পুলের দিকে পালিয়ে গেল।

গুহার ভিতর থেকে বুড়ো বেরলেন অনেকক্ষণ পরে। উচ্চস্বরে গালাগালি করতে করতে। একসময় বললেন : ব্যাটাকে দেখে নেব।

তারপর গলার স্বর আরও নামিয়ে বললেন : অমাবস্যার রাতে শ্মশানে ওর গর্দান নেব।

অন্ধকারে কারণবাবার চোখ আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। বোধহয় সে দুটো বাঘের মতো জ্বলছিল। সকালের সেই মেয়েটা কারণবাবার গুহা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। তার ছেলেটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সোমাকে আমি দেখতে পেলুমনা।

কুড়ি

কর্তব্যে আমাদের ত্রুটি হচ্ছে। গত কয়েকদিনে কাজ যা এগিয়েছে, তাকে সন্তোষজনক বলা চলেনা। কাজ এইরকম শম্বুক গতিতে এগোলে একমাসেও এখানকার তাঁবু উঠবেনা। সরকারকে তার জন্য কৈফিয়ত তো দিতেই হবে, অন্য কোন মারাত্মক খেসারত দিতে হবে বলে আশঙ্কা করছি। কারণবাবার আশ্রমে সেদিনের ঘটনার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে গোবিন্দ তাঁর মৌচাকে ঢিল দিয়েছে। এই ধৃষ্টতা তাঁকে সাময়িকভাবে মেনে নিতে হয়েছে। না মেনে নিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু মানবার প্রয়োজন নেই। তিনি মানবেনওনা।

এমন একটা ঘটনার পরেও তিনি যদি গোবিন্দকে শ্মশানে নিয়ে যান শব সাধনার জন্য, সেও ভাবনার কথা। পিছনেও কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। তান্ত্রিক মানুষের কাছে মারণ উচাটন তো ছেলেখেলার সামিল। নির্জন শ্মশানে হয়তো দুদিন বসবে উত্তরসাধক হয়ে। তৃতীয় দিনে নেচে উঠবে। সে নাচ আর বন্ধ হবেনা।

নরবলির কথা বুঝি সোহনরা বলাবলি করছিল। অসাধ্য এঁদের কিছুই নেই। নিজের দেশে নরবলির এত গল্প শুনেছি যে অবিশ্বাসের কথা মনে আসেনা। বরং ভয়ে সারা শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

মনে হল, এখান থেকে অবিলম্বে আমাদের তাঁবু সরানো দরকার। কাজ অসমাপ্ত থাকে থাক। পরে তা সামলানো যাবে। আমি একা এসে তা সামলে যাব। একটু না হয় বেশি হাঁটতে হবে। গোবিন্দকে রক্ষার জন্য সে কষ্ট স্বীকার করতে আমার কষ্টবোধ হবেনা।

পরক্ষণেই অন্য কথা মনে হল। গোবিন্দ যদি এমনি কষ্ট স্বীকার করে কারণবাবার সঙ্গে তার যোগাযোগ রক্ষা করে! সেও বিচিত্র নয়। গোবিন্দ একরোখা। একসময়ে এই তন্ত্র নিয়ে কত কী তামাসা করত। যতসব অশ্লীল শ্লোক তার মুখস্থ ছিল। আমাকে তার মানে জিজ্ঞাসা করত। মানে বুঝবার জন্য সংস্কৃত জানবার প্রয়োজন হতনা। শুনেই কানে আঙুল দিতে হত। গোবিন্দ খুব গম্ভীর ভাবে বলত, তুমি নিজে অসভ্য কিনা, তাই কানে আঙুল দিচ্ছ। তারপর সেইসব শ্লোকের মানে আমাকে বলত। সে সব খুব উঁচু দরের আধ্যাত্মিক কথা। আমি ভেবে পেতুমনা, এইসব আধ্যাত্মিক কথা এমন আপাত অশ্লীল শ্লোকে লেখবার কী প্রয়োজন ছিল।

গোবিন্দকে আমি এ প্রশ্ন করেছি। তখন সে বলত, বুঝলেনা, এসব হল শিষ্য ধরবার চেষ্টা। প্রলোভন একটু বড়গোছের না হলে ধর্মকর্মে লোক ভিড়বে কেন? আমার মনে হত, এর চেয়েও কোন বড় উদ্দেশ্য হয়তো ছিল। হিন্দু ধর্মে ধার নেই, আকর্ষণ নেই, রাজনৈতিক সুবিধা সুযোগও নেই। হিন্দুরা তাই মুসলমান হচ্ছে, খ্রীষ্টান হচ্ছে। বুদ্ধ ও মহাবীর আবার এই দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মে খানিকটা ব্যভিচারের লোভ না দেখালে গোটা দেশটাই হয়তো বৌদ্ধ বা জৈন হয়ে যেত। শঙ্করাচার্য একা আর কত বাঁচাতেন! এসব আমার নিজের মনের কথা। ইতিহাসে পড়িনি, কোন পণ্ডিতের মুখেও শুনিনি। সত্য হলে কোন পণ্ডিত কি আর তন্ত্রশাস্ত্রের ভূমিকায় এ কথা লিখতেন না?

সকালবেলায় আমি গোবিন্দকে আদেশ করলুম: আজ থেকে তুমি দক্ষিণে যাবে আমার জায়গায় কাজ করতে।

গোবিন্দ ফোঁস করে উঠল: কেন?

বললুম: আমার হুকুম।

আর তুমি কোন্‌দিকে যাবে?

তোমার কাজে।

কিন্তু জরিপের কাজ ছাড়াও আমার অনেক কাজ ছিল।

যদি চাও তো সে সবও করবার চেষ্টা করব।

সব তুমি জান?

বললুম: অন্ধকারে লুকিয়ে সোমার সঙ্গে যোগসাধনা করতে পারব।

গোবিন্দ লাফিয়ে উঠল। বলল: কী বললে?

আমি উত্তর দিলুমনা।

গোবিন্দ আমাকে ছেড়ে দিলনা। বলল: কে তোমাকে এ সব কথা বলল?

অত উত্তেজিত কেন হচ্ছ: আমি উত্তর দিলুম: চোখ থাকলে সবই যে দেখতে পাওয়া যায়।

কী দেখেছ তুমি?

বললুম: সে সব কথা খুব শ্রুতিমধুর নয়। কাজটাও ভাল নয় কিনা, তাই একটু সাবধান হতে বলছি। তুমি মৌচাকে ঢিল দিয়েছ।

একটু বিদ্রূপের সুরে গোবিন্দ বলল: তুমি কি আজকাল জ্যোতিষ-চর্চা করছ?

জ্যোতিষ নয়, জরিপ: আমি উত্তর দিলুম: চোখে দূরবীন লাগিয়ে চারিধারটা ভাল করে দেখি। তাতে কাছের অবস্থা তো ভাল করে দেখতেই পাই, দূরেরও অনেক কিছু দেখতে পাই।

গোবিন্দ আর প্রশ্ন করলনা। আমি বললুম: তোমারও ভবিষ্যৎটা দেখতে পাচ্ছি। এইবেলা সাবধান না হলে ঘরে ফেরা আর সম্ভব হবেনা। তোমার ঐ কারণবাবা কিছু দেখেছেন। বাকিটুকু কল্পনা করে নিতে তাঁর একটুও কষ্ট হয়নি। তুমি কি ভাবছ, তিনি তোমাকে ছেড়ে দেবেন?

তুমি কি—

গোবিন্দ থামতেই আমি বললুম: কাল সন্ধ্যাবেলার কথা বলছি।

গোবিন্দ বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: চক্রে বসবার আগে সোমাকে নিয়ে কেন পাশের গুহায় ঢুকেছিলে? ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করতে পারলেনা?

অভিভূত ভাবে গোবিন্দ বলল: এ সব কথা তুমি কী করে জানলে?

ভয় দেখাবার জন্য বললুম: আরও একটু জানি।

বড় বড় চোখে গোবিন্দ আমার দিকে চেয়ে রইল।

বললুম: কারণবাবা তোমার সর্বনাশের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন।

গোবিন্দর দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেখে বললুম: গুহা থেকে বেরিয়ে তুমি যখন নদীর দিকে পালালে, তখুনি তিনি প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন। ছাগল হলে কাল রাতেই শেষ করে দিতেন, মানুষ বলেই দুদিন সময় পেয়েছ।

ভয়ে গোবিন্দ আঁতকে উঠল কিনা জানিনা, বাহিরে আমি কোন লক্ষণ দেখতে পেলুমনা। আর কোন কথাও কইলনা। তার চেন্‌ম্যানদের ডেকে আমি যখন দক্ষিণে যাবার নির্দেশ দিলুম, তখনও সে চুপ করে রইল। ভাবলুম, ওষুধে কাজ হয়েছে। কিন্তু এই ভাবনা যে কত ভুল, পরে তা বুঝতে পেরেছিলুম।

উত্তরের এলাকার কাজ করে আমি গিয়েছিলুম কারণবাবার কাছে। একটু তাড়াতাড়িই সেখানে গিয়েছিলুম। দুটো কাজ ছিল। প্রথমটা হল সেই অন্ধের খোঁজ। বাবার প্রসাদে লোকটা দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে কিনা জানতে হবে। দ্বিতীয়টা হল, গোবিন্দকে রক্ষার ব্যবস্থা। মনে মনে তার উপায় একটা ঠিক করে ফেলেছি। বাবার মনের কথাটি

জেনে নিতে হবে। সে কথা যদি মারাত্মক হয় তো রাগটা যাতে গোবিন্দর উপর থেকে আমার উপরে এসে পড়ে, তার চেষ্টা করতে হবে।

কারণবাবার আশ্রমের দিকে যেতে যেতে মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে উপকারটা কার করছি! গোবিন্দর, না আমার নিজের! আমি নিজেও কি সোমার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হইনি। ঐ মেয়েটার চোখে কি চুম্বকের শক্তি নেই! গোবিন্দ তো তন্ত্রসাধনার লোভেই এসেছিল। যখন এসেছিল, তখন সে সোমাকে জানতনা। এখন বাঁধা পড়েছে। হঠাৎ এই বাঁধন ছেঁড়া কি তার পক্ষে সহজ হবে।

তারপরেই মনে হয়েছিল, আমিও কি যাচ্ছিনা এই বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে! মাকড়শার মতো আমি নিজের লালা দিয়ে জাল বুনছি। তাতে কে আটকা পড়বে জানিনা, নিজে জড়িয়ে থাকবার জন্য তা যথেষ্ট।

চলতে চলতেই এ সব কথা আমার মনে হয়েছিল। পা কিন্তু থামেনি। থেমেছে নদীর পুল পেরিয়ে সেই গুহার মুখের সামনে। কোন্‌টায় ঢুকব, তারই জন্য ইতস্তত করেছিলুম। সামনের বড় গুহাটায় কারণবাবা হয়তো কারণে বুঁদ হয়ে আছেন। সোমা নিশ্চয়ই পাশের গুহায় আছে। কী করছে সে! কী করে সময় কাটায়! দুপুরটা কি সে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায়? কোন কোন দিন যে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যায়, সে কথা আমি তার ছোটবোন পেমার কাছে শুনেছি। এখন সে নিশ্চয়ই কারণবাবার গুহায় শুয়ে নেই।

বেশিক্ষণ আমি ইতস্তত করিনি। সাহসে ভর করে সোমার গুহার ভিতরেই ঢুকে পড়লুম। অন্ধকার এখানে গাঢ় নয়, আলোও নেই পর্যাপ্ত। সামনের বড় পাথরখানা সূর্যরশ্মির পথ রোধ করেছে, কিন্তু আলোকে আটকাতে পারেনি। আলোর পথ অবারিত—যেমন জ্ঞানের, যেমন মনের।

সোমাকে আমি গুহার ভিতর দেখতে পেলুমনা। যাকে দেখতে পেলুম, তাকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হলনা। সেই অন্ধ লোকটার বউ। একটা কোণায় মুখ ঢেকে বসে ছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। আমি তার চোখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কাল বিকেলের মতো তার দৃষ্টি আজ উজ্জ্বল নয়। আজ তা ভারাক্রান্ত। আচরণে উচ্ছলতা নেই এতটুকু, ক্লান্তিতে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বললুম ঃ কী হয়েছে তোমার ?

মেয়েটি উত্তর দিলনা।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ তোমার স্বামী কোথায় ? সে তার চোখ ফিরে পেয়েছে তো ?

উত্তরের বদলে সে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলুম। ঠিক এমনটি কি আমি আশঙ্কা করেছিলুম! এ তো শুধু আশাভঙ্গের কান্না নয়, এর আড়ালে যেন গভীর কোন বেদনা আছে!

অনেকক্ষণ আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলুম। হঠাৎ তার ছেলের কথা মনে পড়ল। তাকে তো দেখতে পাচ্ছিনা! তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলুম ঃ তোমার ছেলে কোথায় ?

কিন্তু সে কথা কে বলবে! কান্নায় সে ভেঙে পড়েছে।

আমি আর দাঁড়াতে সাহস পেলুমনা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম গুহার ভিতর থেকে। কান্নাকে আমার ভয় করে। মানুষের কান্নায় উত্তাপ আছে, মন গলে বরফের মতো। মনটা শক্ত রাখতে হলে পালাতে হবে বৈকি। আমি পালিয়ে গেলুম।

একুশ

বাহিরে এসে আমি আরও আশ্চর্য হলুম। হামাগুড়ি দিয়ে পাশের গুহার ভিতর কে ঢুকে গেল। চোরের মতো সন্তর্পণে ঢুকল। লোকটাকে দেখবার জন্য আমি এগিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু সেই নরমুণ্ডগুলি আমাকে বাধা দিল। মনে হল, তারা একসঙ্গে আমার দিকে চেয়ে ভেংচি কাটছে। কাটবেই তো। কাপুরুষের মতো আমি একটা অসহায় মেয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম। আমি তো উপহাসেরই সামগ্রী।

আমি জানতুম, গোবিন্দ আজ ঐ গুহার ভিতরে নেই। সোমাও নেই। হয়তো সেই অন্ধ মানুষটাও নেই। কারণবাবা একা বসে বসে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করছেন বিকৃতমুখে। আমি কোনদিন মদ খাইনি। কিন্তু নিশ্চয়ই জানি, মানুষ আস্বাদের জন্য মদ খায়না। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি যে এক চুমুক মদ গিলতে কত কষ্ট পেতে হয়। তবু মানুষে মদ খায়। খাবার পর নাকি ভাল লাগে, চোখে রঙ লাগে, দুঃখ ভুলে যায়, দুনিয়ার চেহারাটাই যায় বদলে। কারণবাবা কেন এত মদ খান? পাত্রে ঢেলে খেলে মদের নামটাই শুধু কারণ হয়, জিনিসটা তো পাল্টায়না। কারণে বেশি আসক্তির জন্যই বোধহয় তাঁর নাম হয়েছে কারণবাবা।

হঠাৎ আমার কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল। এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আমার চলবেনা! আর দ্বিধা না করে আমিও হাঁটু মুড়ে বসলুম, আর গুহার ভিতরে ঢুকলুম হামাগুড়ি দিয়ে।

কারণবাবা চীৎকার করে উঠলেন। অশ্রাব্য গালাগালি। কিন্তু আজ আমি বিচলিত হলুমনা। আজ আমার সাহস বেড়ে গেছে।

পাশের গুহায় আমি একটা মেয়েকে কাঁদতে দেখেছি। আর দেখেছি আর একটা লোককে চোরের মতো এই গুহায় ঢুকতে। ঐ গালাগালিকে আমি আর ভয় পাইনে। সরাসরি আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলুম।

কারণবাবাকে শান্ত হতেই হবে। হলেনও। তখন আমি কথা কইলুম। জিজ্ঞাসা করলুম: গোবিন্দ কোথায়?

দরকার?

কারণবাবা তাঁর রাঙা চোখ তুলে কটমট করে চাইলেন।

বললুম: জানেন না নিশ্চয়ই!

কী!

বলে আবার তিনি খানিকক্ষণ গালাগালি করলেন।

মনে মনে আমি হাসলুম। আমার কাছে আজ তিনি হেরে গেছেন। বললুম: আপনি যে জানেন না, আমি তা জানতুম।

কারণবাবা এ কথা মেনে নিলেন না। বললেন: শ্মশানে বেঁধে রেখেছি। আজ রাতে বলি দেব।

প্রথমটায় আমি শিউরে উঠেছিলুম। তারপরেই মনে হল, এ তাঁর বানানো কথা। গোবিন্দর খোঁজ তিনি জানেন না। বললুম: গোবিন্দ সোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কারণবাবা আর একবার চাইলেন কটমট করে।

বললুম: বিশ্বাস হচ্ছেনা, না? ঐ মেয়ে এবারে আমার সঙ্গে চক্রে বসবে। ব্যবস্থা আমি পাকা করে ফেলেছি।

তন্ত্রসাধনার কী বুঝিস ব্যাটা!

কারণবাবা গর্জন করে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম: আসল কাজটুকু ঠিক বুঝি। পঞ্চ ম-কারের সাধনা তো এমনিতেই করি, এবারে বেশ ভাল করে নিয়মিতভাবে করব।

কারণবাবা একটা ভেংচি কেটে বললেন : হুঁ।

হুঁ মানে ?

মানে বুঝলে ফুর্তি ঘুচে যেত।

বললুম : পঞ্চতত্ত্ব না হলেও চলে এমন লোক আর কটা আছে ! মদ মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন। মুদ্রা হল শস্যসামগ্রী, টাকাও বটে। ও না হলে আমাদের কারও চলেনা। বাকিগুলোর রসে বঞ্চিত হলে আবার আমাদের জন্ম নিতে হবে।

বিড়বিড় করে কারণবাবা খানিকক্ষণ গালাগালি করলেন। বললেন : পঞ্চ ম-কারের রাজসিক অর্থটাই তো লোভনীয় লাগে কিনা ! হতভাগা নাস্তিক কোথাকার !

আজ গালাগালি শুনতে আমার ভাল লাগছে। বললুম : সমস্ত যোগাড় করে এসেছি। সন্ধ্যাবেলায় সোমাকে নিয়ে বসব।

কারণবাবা চেঁচিয়ে উঠলেন : খবরদার ! না জেনে শুনে এ সব করবিনা !

মদ খেয়ে মাতলামিটাও কি শিখে করতে হবে নাকি ?

আমি নির্ভয়ে তাঁকে উত্তর দিলুম।

ভাল চাস তো সাত্ত্বিক বা তামাসিক অর্থে পঞ্চ ম-কারের সেবা কর।

এ সব অর্থভেদের কথা আমার কিছু জানা নেই। বললুম : যা জানি, তাইতো করব।

কারণবাবা খানিকটা শান্ত হলেন। বললেন : এগিয়ে বোস্।

এগিয়ে বসতে আমি সাহস পেলুমনা। ঝক্‌ঝকে খাঁড়াটা আছে দূরে। কিন্তু সিঁদুর-মাখা ত্রিশূলটা মাটিতে পোঁতা আছে তাঁর ডান হাতের কাছেই। ওটা তুলে নিয়ে পেটে খোঁচা দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবেনা। নাগালের বাইরে থাকাই নিরাপদ। আমাকে নড়তে না দেখে বললেন : কি রে, ভয় করছে বুঝি ?

তা একটু করছে বৈকি।

কারণবাবা খুশি হলেন, বললেন: ব্যাটা সত্যি বলতে শিখেছে তো!

বললুম: বলুননা আপনি, এইখান থেকেই আমি শুনতে পাব।

কারণবাবা বললেন: সমাজটা চিরদিন এক রকম ছিলনা। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেও এ সবের অবাধ প্রচলন ছিল। আটকালো কালতে এসে। ভিতরে যত পাপ ঘনাতে লাগল, আমরা বাইরে তত সাধু সাজতে লাগলাম।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: সেকালেও পঞ্চম-কারের প্রচলন ছিল!

ছিলনা!: কারণবাবা উত্তর দিলেন: আপত্তি তো মদ আর মৈথুন নিয়ে, বেদ পুরাণে তার অজস্র দৃষ্টান্ত।

তারপর গড়গড় করে বললেন: বেদের সোম যজ্ঞে ও সৌত্রামণি যজ্ঞে মদের অবাধ ব্যবহার ছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য শিষ্য কচকে মদের সঙ্গে ভক্ষণ করেছিলেন। মহর্ষি দত্তাত্রেয় সস্ত্রীক সুরাপান ও গীতবাদ্য ও বনিতা ভোগ করতেন। রামচন্দ্র সীতাকে মাধ্বক সুরা পান করিয়েছিলেন, আর মৈরেয়ক মদ্যপান করে যাদবকুল ধ্বংস হয়েছিল। মদ খেয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও পদস্খলন হয়েছিল। নিজের কন্যা সন্ধ্যার দিকে চেয়েছিলেন কামার্ত দৃষ্টিতে। রুদ্রদেব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে স্বয়ম্ভুর পঞ্চম শির কেটে সন্ধ্যাকে রক্ষা করেছিলেন।

বাধা দিয়ে বললুম: থাক এ সব গল্প।

কারণবাবা বিশ্রীভাবে দাঁত বার করে হাসলেন। বললেন: স্ত্রী-পুরুষের যৌন স্বাধীনতার কথা শুনবিনা? দেবগুরু বৃহস্পতি কী করেছিলেন! সে নোংরা কথা মুখে বলতে বাধে। সে যুগটাই ঐরকম ছিল। মহর্ষি উদ্দালক সপরিবারে বসে আছেন। এক ঋষি এসে তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। মহর্ষির আপত্তি করার উপায় নেই, কিন্তু ছেলে ক্ষেপে গেল।

দোহাই বাবাঃ আমি হাত জুড়ে অনুরোধ করলুমঃ এসব গল্প তুমি অন্য লোককে শুনিয়ো।

কারণবাবার হাসিটাও বড় বীভৎস। বললেনঃ তবে তুই চক্রে বসেছিস।

বললুম ঃ আপনার সাত্ত্বিক পঞ্চ ম-কারের গল্প বলুন।

সে কি ভাল লাগবে? সহস্রার থেকে অমৃতের ক্ষরণ হবে, সেই মদ, সেই ব্রহ্মজ্ঞান। মা মানে রসনা। বাক-সংযমের নামই মাংস সাধনা। যে মানুষ জ্ঞানের অসি দিয়ে পাপ পুণ্যকে ধ্বংস করে হৃদয়বৃত্তি লয় করেন, তাঁকে মৎস্যভোজী বলা যায়। সহজ কথায় কুম্ভকযোগ। অসৎসঙ্গ ত্যাগের নামই মুদ্রাসাধনা। আর মৈথুন হল শেষ অবস্থা—

কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্॥

মূলাধারের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগবলের সাহায্যে শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলাসীন পরম শিবের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো—তারই নাম মৈথুন। সহস্রার থেকে তখন অমৃতের ক্ষরণ হবে।

একটু থেমে কারণবাবা বললেনঃ এরই নাম দিব্য ভাবের সাত্ত্বিক পঞ্চ ম-কার। আর যার জন্যে তোরা পাগল হস, সে হল বীরভাবের রাজসিক পঞ্চ ম-কার। পশু ভাবের তামসিক পঞ্চ ম-কার একেবারে নিরামিষ। পঞ্চতত্ত্বের বদলে তার অনুকল্প দিয়ে ক্রিয়া সারতে হবে। মদের বদলে দুধ ঘি মধু, মাংসের বদলে আদা-রসুন, মাছের বদলে মূলো বেগুন, মুদ্রার বদলে চাল গম, আর মৈথুনের বদলে কূর্মমুদ্রায় তিনবার পুষ্পাঞ্জলি। আরও অনেক অনুকল্প আছে, সে সবই নিরামিষ। তোদের মতো শয়তানের তা পছন্দ হবেনা।

আমি লক্ষ্য করছিলুম, কারণবাবা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি থামতেই জিজ্ঞাসা করলুমঃ কিসের ভাবনা হচ্ছে বলুন তো?

কারণবাবা খেঁকিয়ে উঠলেন। আমি জানি, তিনি তাঁর দুর্ভাবনা লুকোবার চেষ্টা করলেন।

ভৈরবী কোথায় ?

আমি জানতে চাইলুম।

বিরক্তভাবে কারণবাবা বললেন : চুলোয় গেছে !

আমি বোধহয় এইরকম উত্তরের আশা করেছিলুম। তাই খুশি হয়ে বললুম : উঠি আজ।

আরও কয়েক পাত্র কারণ গলাধঃকরণ করে তিনি উত্তর দিলেন : সব ব্যাটা ভৈরবীর খোঁজে আসে !

হামাগুড়ি দিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। জড়িয়ে জড়িয়ে তিনি বলতে লাগলেন : একটা একটা করে ব্যাটাদের বলি দেব !

পাশের গুহাটায় আমি আর গেলুমনা। মেয়েটা এখনও নিশ্চয়ই মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। তার ছেলে নেই। ছেলেটা কি চুরি হয়ে গেল ! ভাবতে আর ভরসা হলনা। তাড়াতাড়ি আমি নদীর দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

পুলের উপর উঠে আমি সেই অন্ধ লোকটাকে দেখতে পেলুম। গত সন্ধ্যার মতো আজও সে একা একখানি পাথরের উপর বসে আছে। পাশে তার লাঠিগাছটি। মনে হল, তাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বড় রিক্ত, বড় অসহায়। কারণবাবাকে আজ তার চেয়েও বেশি অসহায় দেখেছি।

সন্ধ্যা নামছে।

বাইশ

ফেরার পথে গোবিন্দর একটা কথা আমার মনে পড়ল। গোবিন্দ একদিন বলছিল যে তন্ত্রসাধনাকে দেশে জনপ্রিয় করবার প্রয়োজন হয়েছে। তার যুক্তি বড় অদ্ভুত। বলেছিল, দেশ থেকে ধর্মচর্চা একেবারে উঠে গেছে। যেটুকু আছে, তা নিতান্তই লোক-দেখানো। মানত না থাকলে কোন হিন্দু মন্দিরে যায়না। বিদেশের মন্দিরে যায় তার কারুকার্য দেখতে। দোল দুর্গোৎসবে পূজোটা উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য হল মাতামাতি। বামুনের ছেলে পৈতে নিয়ে তিনদিনও ত্রিসন্ধ্যা করেনা, চতুর্থ দিনে সেই ন গাছি সূতো দেওয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখে। এই তো হিন্দুর ধর্মসেবা।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তন্ত্রসাধনার প্রসার হলে কি কিছু সুবিধে হবে? গোবিন্দ উত্তর দিয়েছিল, হবে বৈকি। কোনরকমে বামাচারী হতে পারলে কত লোভনীয় ক্রিয়ার অধিকারী হওয়া যায় বল। ধর্ম সেবার জন্য না হোক, অধর্মে স্বাধীনতার জন্য লোক তান্ত্রিক হবে।

তাতে লাভ? আমি জানতে চেয়েছিলুম। গোবিন্দ বলেছিল, লাভ পরে। দস্যু রত্নাকর রাম নাম উচ্চারণ করতে পারেননি; মরা মরা বলতে বলতেই তাঁর সিদ্ধি হয়েছিল।

কথাটা মিথ্যা নয়। দেশের চারিত্রিক কাঠামো আজ ভেঙে গেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দেশকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়নি, স্বাধীনতা যেখানে কুড়িয়ে পাওয়া গেল, স্বাধীনতার মূল্য সে দেশ কী করে বুঝবে! গুটিকয়েক মানুষ নিয়ে তো দেশ নয়। তা যদি হত, তাহলে আজ এত দুর্দশা থাকতনা। দেশে আজ নীতির অভাব। তারই সঙ্গে রুচির বিকার ঘটছে। এই অধঃপতন থেকে দেশকে রক্ষা করতে

হলে কোন কড়া নেশার দরকার। কারণবাবা নাকি গোবিন্দকে একদিন এই নেশার কথা বলছিলেন। রক্তের চেয়ে বড় নেশা নেই। দেশ যখন রক্তে ভেসে যায়, সেই পাশবিক লীলার মধ্যে মানুষ তার মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়। যে দেশে স্বাধীনতা আসে রক্তস্রোত বেয়ে, সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার মর্ম বোঝে। সম্মান করে নীতিবোধকে, চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষায় সারাক্ষণ সচেষ্ট থাকে।

তারপর ধর্মের নেশা। ধর্মের প্রেরণাতেও কোন দেশ গড়ে উঠতে পারে। আমরা রক্ত চাইনে। তাই ধর্মকে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। এই বাঁচার দাম আরও বেশি। জীবন দীর্ঘস্থায়ী। একদা এই ভারতবর্ষ ছিল ধর্মাশ্রয়ী। জীবনের বিকাশ হয়েছিল আধ্যাত্মিক চেতনায়। এ দেশ তাই আজও মরে যায়নি। চট করে মরবেনা। মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র একদিন জানা ছিল। তাই মরতে মরতেও বেঁচে উঠবে। কারণবাবা নাকি বিশ্বাস করেন, তন্ত্র হল সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র। দেশ যখন পাপে পঙ্কিল হয়ে যাবে, তখন যৌন স্বাধীনতার সমর্থন চাইবে ধর্মের নামে। তন্ত্রে সেই সমর্থন আছে। গোবিন্দ বলে, চক্র আর লতা সাধন তো ব্যভিচারের নামান্তর। তবু কারণবাবা এই তন্ত্রকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বলেন। ও যে রাম নাম। জপতে জপতেই সিদ্ধি আসে।

এ সমস্ত একদিন ভণ্ডামি বলে আমার মনে হয়েছিল। ধর্মাচরণের পিছনে কোন রাজনৈতিক যুক্তি থাকতে পারে! না, এত সব ভেবে কেউ ধর্মাচরণ করে! তবু কেন কারণবাবা এইসব ভাবলেন, এই কথা ভেবে আমার আশ্চর্য বোধ হল। সত্যিই কি তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে! খণ্ডিত ভারতকে কি তিনি ধর্মের বাঁধনে বাঁধতে চান? তাই যদি সত্য হয়, তবে লোকালয়ের বাহিরে এই পাহাড়ে কেন আশ্রয় নিয়েছেন!

শোঁ শোঁ করে ঝাউ এর পাতা কাঁপছে। তার বীচির ভাঙা

খোলাগুলো মটমট করে গুঁড়িয়ে গেল পায়ের নিচে। নিজের বিশ্বাসও এমনি করে কাঁপে আর ভাঙে। কথাটা তো মিথ্যে নয়! শাস্ত্রমতে এখন ঘোর কলি। তন্ত্র প্রাধান্য পাবে এই কলিযুগে। সত্যিই তো, মানুষের রুচি আজ যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, ব্যভিচারের স্বাধীনতাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। তন্ত্রে সেই আকর্ষণ আছে। গোবিন্দ ছুটে এসেছে। গোবিন্দর মতো মানুষ ভারতে অনেক আছে। আমিও কি আসিনি!

ভাবতে ভাল লাগছিল না। অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছিল। কান পেতে শুনছিলুম, কারও পদধ্বনি শোনা যায় কিনা। চোখ মেলে চাইছিলুম, কারও দেখা মেলে কিনা। তাহলে আমার ভাবনার পালা শেষ হবে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারব। সুস্থ বোধ করব।

গ্রামের দিক থেকে যে রাস্তাটা এসে নদীর ধারে মিশেছে, সেই তিন মাথায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালুম। কেউ আসছে। অন্ধকার এমন কিছু গভীর হয়নি যে তাকে চিনতে কষ্ট হবে। সোমা আসছে। ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে নয়। তার চটুল চরণে আমি নির্ঝরের নৃত্য দেখতে পেলুম। পায়ে নূপুর বাঁধা থাকলে জলতরঙ্গের সুর শুনতে পেতুম স্পষ্টভাবে। সোমাই আসছে। কিন্তু একি, তার হাত দুটো কেন বুকের উপর জোড়া! সেই ছেলেটা বুঝি!

আমারও বুকের উপর থেকে একখানা পাথর নেমে গেল। খুশিতে সমস্ত মন গেল ভরে।

আমার কাছাকাছি এসে সেও থমকে দাঁড়াল। আজ আমাকে আর কথা কইতে হলনা। সোমা নিজেই প্রশ্ন করল: তুমি এখানে?

হেসে বললুম: তোমার অপেক্ষাতেই যে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার অপেক্ষায়!

সোমা বিস্মিত হল অপরিমিত।

আমি কি অন্যায় করেছি?

অন্যায়ঃ সোমা এবারে সহজ হয়ে গেল, বলল ঃ তোমরা ভারি দুষ্ট।

আমরা কারা?

তুমি আর তোমার বন্ধু।

সোমা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলুম। নাগালের বাহিরে না হলে তাকে কাছে টেনে নিতে পারতুম। এগিয়ে ধরে ফেলতে লজ্জা হল। বললুম ঃ এস না, এই নদীর ধারে একটু বসি।

সোমা ফিরে দাঁড়াল। হাসল মায়াবিনীর মতো। বলল ঃ তোমাদের দুষ্টুমির শেষ নেই!

নদীর দিকে নেমে যেতে যেতে বললুম ঃ গোবিন্দ কোথায়?

সোমা ছোট্ট উত্তর দিল ঃ জানিনে।

তবে আমাকেই আজ গোবিন্দ ভাব না!

সোমার দেহে মনে আজ অদ্ভুত প্রসন্নতা দেখলুম। হাসতে হাসতেই সে আমার কাছে নেমে এল। আমার পাশে বসল একই পাথরের উপর। ছেলেটাকে বুকের উপর চেপে ধরেছে।

পাথরটা আমি ভাল করে দেখলুম। এত বড় না হলে গায়ে গায়ে ঘেঁষে বসতে হত। তার দেহের উত্তাপ পেতুম। স্পর্শও। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেব!

এই মেয়েটাকে গোবিন্দর ভাল লেগেছে। সবারই লাগবে। ভাল মেয়েকে কার না ভাল লাগে! আমার নিজেরও কি লাগেনি! এ কথা জানতে পারলে গোবিন্দ কি রাগ করবে? কেন করবে! আমি তো রাগ করিনি!

সোমা সহসা হেসে উঠল।

হাসলে যে?

তোমার ভাব দেখে।

তাড়াতাড়ি আমি নিজের দিকে চাইলুম, চাইলুম সোমার দিকে। নদী বন পাহাড় আর আকাশের দিকেও তাকালুম। মনে হল, সব একাকার হয়ে গেছে। কাউকে আজ পৃথক করে দেখা যাচ্ছেনা। সবাই আমরা সবার সঙ্গে মিলে গেছি। ছোট ছেলেটাও কাঁদতে জানেনা।

সোমা অনেকক্ষণ পরে কথা কইল। বলল: তোমরা দুজনেই দুষ্টু।

কে বেশি বল তো?

ভেবেছিলুম, এ কথার উত্তর সোমা দিতে পারবেনা। কিন্তু তখুনি সে উত্তর দিল: দুজনেই সমান।

কারণবাবা বুঝি লোক খুব ভাল?

সোমা চমকে আমার দিকে চাইল।

চমকালে কেন! তাঁর ভগবতীর আমরা সম্মান রাখছিনে, জানতে পারলে আর রক্ষা রাখবেন না, এই তো!

সোমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ছেলেটাকে মুখের কাছে তুলে আদরে আদরে অস্থির করে দিল। কিন্তু কোন উত্তর দিলনা।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: আজ তোমরা চক্রে বসবেনা?

না।

কাল?

কালও না। আর কোনদিন বসবনা।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু তার বিরাগের কারণ সোমা আমাকে জানালনা।

জিজ্ঞাসা করলুম: রাগটা কার ওপর?

রাগ নয় তো: ছেলেটার সঙ্গে খেলা করতে করতে সোমা উত্তর দিল: চক্র আমার ভাল লাগেনা।

আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন সে তার গর্বের কথা আমাকে শুনিয়েছিল। কারণবাবা তাকে পুজো করে। সে তখন আর সোমা নয়, সে ভগবতী। সবাই তাকে পুজো করবে। কিন্তু আজ তার সে অহংকার দেখতে পেলুমনা। মনে হল, ঠিক কথাটি সে বলতে পারলনা। আজ তার অন্য কিছু ভাল লেগেছে। বোধহয় একটা সহজ সুস্থ জীবনের আস্বাদ পেয়ে কৃত্রিম জীবনটাকে আর ভাল লাগছেনা। বললুম: কারণবাবা তাহলে কী নিয়ে বাঁচবেন?

তাঁর তো শ্মশান আছে। সেখানেই তিনি সাধনা করতে যাবেন।

গোবিন্দও যাবে?

আজ যাবে।

আবার!

আমি বোধহয় ভয় পেয়েছিলুম। তাই লক্ষ্য করে সোমা বলল: তুমি ভারি ভীরু।

বললুম: ভয় পাবারই যে কথা। কারণবাবা বলেছিলেন, গোবিন্দকে তিনি কেটে ফেলবেন।

কাটলেই হল!

সোমা ঠোঁট ওল্টাল। তার নির্ভীক দৃষ্টিতে আমার বিস্ময় বাড়ল। কিন্তু আর কিছু প্রশ্ন করবার অবকাশ পেলুমনা। সোমা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বললুম: আর বসবেনা বুঝি?

না।

সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে সোমা রাস্তার উপর উঠে এল। বলল: আসি।

আমি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তার চলা দেখতে লাগলুম। ছেলেটাকে বুকের উপর চেপে সে নেচে নেচে পথ চলেছে।

দিনের আলো কি মিলিয়ে গেল! রাতের আলো বুঝি আরও মিষ্টি!

তেইশ

ক্যাম্পে ফিরে আমি বিস্মিত হয়ে গেলুম। খালাসিরা পেট্রম্যাক্স জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসেছে। কিন্তু অন্যদিনের মতো উচ্চ কণ্ঠে কেউ রামায়ণ পড়ছেনা। কিছু যে পড়ছে, তা দূর থেকেই বুঝতে পারলুম। ভূতো অভিনন্দন জানাল তার নির্ধারিত প্রথায়। কিন্তু তার মধ্যেও খানিকটা সংযম দেখলুম।

সোহন উঠে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম: গোবিন্দ ফিরেছে?

সোহন সংক্ষেপে উত্তর দিল: ঘুমচ্ছেন।

সন্ধ্যাবেলায় তাঁবুর ভিতর শুয়ে ঘুমচ্ছে! কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো!

তাড়াতাড়ি আমি ভিতরে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখলুম। পরম নিশ্চিন্তে সে ঘুমচ্ছে। সারারাত্রি জাগরণের পর মানুষ এমন অকাতরে ঘুমতে পারে! সে কি আর একটা রাত জাগার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! সোমার কাছে তো সেই রকম কথাই শুনেছি। বুকটা আমার কেঁপে উঠল।

বাহিরে এসে সোহনকে জিজ্ঞাসা করলুম: গোবিন্দ খেয়েছে?

খেয়েছেন।

সোহন এর বেশি কিছু বলল না। ভূতো আমার পাশে এসে পায়ের উপর মুখ ঘষতে লাগল।

শুক্লপক্ষের রাত। আকাশের ফালি চাঁদ এখনও দেখতে পাইনি। তারার ম্লান আলো। গাছপালার একটা পাতাও নড়ছেনা। পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলায় প্রকৃতির রূপ অনেকদিন দেখিনি। রোজই কি তার এমন নিষ্প্রাণ অবস্থান!

রাতে ঝড় উঠেছিল কিনা জানিনা। সকালবেলায় সব কিছু এলোমেলো বলে মনে হল। তাঁবুর ভিতর কাগজ পত্র আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাহিরেও তাই। কিন্তু গোবিন্দ সন্ধ্যাবেলার মতো নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। তবে কি রাতে সে কোথাও যায়নি!

আসল খবরটা রাম সিং-এর কাছেই পেলুম। ঝড়ের ঝাপটায় তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রবলভাবে ডাকতে ডাকতে ভুতো নেতিয়ে পড়ল। তার বেশি সে কিছু দেখতে পায়নি। দেখতে পেল ঝড় থামবার পর। চোরের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে গোবিন্দ ফিরে এল। রাত তখনও ভোর হয়নি। কিন্তু ভূতোর ডাকে রাম সিং-এর দৃষ্টি সজাগ হয়েছিল।

কেন জানিনা আমার মনে হল, আমার দুর্ভাবনার শেষ আজ এইখানেই হয়ে গেল। সোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে আজকের রাতটা দুর্যোগের হবে। বলেছিল, গোবিন্দ আজ রাতে যাবে শ্মশান সাধনায়। তার পরে যাবে কিনা, সে কথা সে বলেনি। বিছানায় শুয়ে ভেবেছিলুম, আজকের রাতটা আমি জেগেই কাটাব। গোবিন্দকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কী বিপদ নিমন্ত্রণ করে আনে, তার ঠিক নেই। তাকে চোখে চোখে রাখাই কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্যের কথা কতক্ষণ মনে ছিল, এখন তা মনে করতে পারছিনা। এমন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গিয়েছিলুম যে রাতে ঝড়ের শব্দও শুনতে পাইনি।

যখন আমি সরে যাচ্ছিলুম, সোহন আমাকে আর একটা খবর দিল: সেই ছোকরাটি কাল রাতে ফেরেনি।

কোন্ ছোকরা?

প্রশ্ন করেই মনে পড়ল সেই খালাসি ছোকরার কথা। প্রতি সন্ধ্যায় সে গ্রামে যায়, ফেরে রাত করে। তার এই দুর্বলতার কথা

ক্যাম্পে কারও অজ্ঞাত নেই। সমর্থন না থাকলেও, বাধা তাকে কেউ দেয়নি। কিন্তু এতটা যে প্রশ্রয় পাবে, সে আশঙ্কা কারও ছিলনা। সোহন আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার বোধ করলনা। বলল: তাকে খুঁজে আনা হয়েছে!

আর কিছু জানতে চাইবার প্রবৃত্তি হলনা। বললুম: বেরবার জন্যে তৈরি হও।

বেরবার সময় সোহন বলল: কোন্ দিকের নক্সা নেব হুজুর, উত্তরের না দক্ষিণের?

কাজ আমরা দক্ষিণেই করছিলুম। কাল উত্তরে গিয়েছি গোবিন্দর জায়গায়। এ প্রশ্ন তার সঙ্গত বটে। বললুম: রোজই আমরা উত্তরে যাব।

আমার নির্দেশের কথা গোবিন্দ শুনতে পেয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। বলল: না না, দক্ষিণে আমি যেতে পারব না। দক্ষিণে তোমরা যাও।

গজ স্ট্যাণ্ড দূরবীন নিয়ে খালাসিরা দাঁড়িয়ে আছে। সোহন যাচ্ছিল নক্সার চোঙা আনতে। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

গোবিন্দকে বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কতকটা সামলে নিয়ে বলল: শ্মশানের দিকে আমার বড় ভয় হয়। আমাকে উত্তরেই যেতে দাও।

মনে হল, গোবিন্দ সত্য বলছেনা। গভীর রাতে একাকী শ্মশানে যেতে যার কিছুমাত্র শঙ্কা জাগেনা, সে কি দিনের বেলায় লোকজন নিয়ে কাজে ভয় পাবে! বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হল। তবু বললুম: যাবে যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রো।

গোবিন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আমরা দক্ষিণেই গেলুম।

চলতে চলতে পঞ্চ ম-কারের কথা আমার মনে এল। কাল আমি তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনেছি। সেই ব্যাখ্যা মনের আগুনে পরিপাক হয়ে বড় সুন্দর লাগছিল। মদ্য মানে ব্রহ্মানন্দ, মাংস মানে মৌনাবলম্বন, মৎস্য মানে জ্ঞানার্জন, মুদ্রা মানে সংযম ও মৈথুন মানে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের মিলন। এই তো পরম যোগ! এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সাধনা আর কী আছে! থাকবেই বা কী করে! হরপার্বতী স্বয়ং হলেন তন্ত্রবক্তা। মহাদেবের আগম শাস্ত্র ও ভগবতীর নিগম শাস্ত্র। দেবতা কি কখনও কুৎসিত শাস্ত্রের প্রচার করেন!

তন্ত্রের নানা আচার হলেও ভাব মাত্র তিনটি। মানসিক ধর্মের নাম ভাব। জীবনের প্রথম ষোল বৎসর পশুভাব, বীরভাব পঞ্চাশ পর্যন্ত, তারপর বাণপ্রস্থে দিব্যভাব। ভাবের আবার অভিষেক আছে। আট রকমের অভিষেক। পূর্ণাভিষেকের পর মানুষের শিবসাযুজ্য।

তন্ত্রের কোন স্থানে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় ভাবই লক্ষ্য করা যায়। শিবশক্তির সংজ্ঞার সঙ্গে এর বিরোধ নেই। তন্ত্র বলে ঃ

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদা পূর্ণঃ সাচ্চদানন্দলক্ষণঃ॥

তিনি এক, তিনি তৎ রূপ, তিনি সত্য, তিনি অদ্বৈত, তিনি পরাৎপর। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি সদা পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ। এ কথা আমাদের কাছে নূতন নয়। এ কথা বেদে আছে, উপনিষদে আছে, আমাদের পুরাণে ও দর্শনে আছে। সেই সৃষ্টিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, পঞ্চমহাভূতের কথা ও স্বর্গ-নরক-বাসের প্রসঙ্গ। জন্মান্তর ও পাপপুণ্যের একই ব্যাখ্যা।

একদিন গোবিন্দ আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে তন্ত্রে ব্যভিচারের প্রশ্রয় নেই। বিবাহিত স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি সকাম দৃষ্টি তন্ত্রে নিন্দিত হয়েছে। শুধু প্রায়শ্চিত্ত নয়, গুরুদণ্ডেরও বিধান আছে।

ব্যাভিচারীকে বিকলাঙ্গ করে নির্বাসনের বিধান। সেদিন গোবিন্দর এই ব্যাখ্যা আমি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু কেন জানিনা, আজ আমার এইসব কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হল, তন্ত্রের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল ধারণা জন্মেছে। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তন্ত্রমতকে হয়তো অকারণে বিকৃত করা হয়েছে। এর পিছনেও কি কোন উদ্দেশ্য আছে!

সোহন হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল।

তারা আমার পিছনে আসছিল। চমকে ফিরে দেখলুম যে তারা পথে দাঁড়িয়ে কথা কইছে কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে। দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাই চেঁচিয়ে বললুম: কী হল?

সোহন ছুটে এগিয়ে এল। বলল: সর্বনাশ হয়েছে।

কিসের সর্বনাশ?

হাঁপাতে হাঁপাতে সোহন উত্তর দিল: খুন।

খুন! কে খুন হল! সোমা?

না হুজুর!

সোহন ভয়ে কাঁপতে লাগল। পাংশু দেখাচ্ছে তার সমস্ত মুখখানা। যেন মস্ত বড় একটা অকল্যাণ হয়েছে।

তার সঙ্গীরাও এগিয়ে এসেছে। তাদেরই একজন বলল: কারণবাবা খুন হয়েছেন হুজুর, শ্মশানে তাঁর লাস পড়ে আছে।

আমি অভিভূত হয়ে গেছি।

সোহন বলল: মড়া ফেলে এরা পালিয়ে এল।

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বললুম: চল তো!

শ্মশানে যাবেন!

সবাই আশ্চর্য হল আমার অভিপ্রায় জেনে। কিন্তু আমার অনুসরণ করতেও দ্বিধা করলনা।

[illegible] পরেই সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলুম। যেখানটায় মৃতদেহ নামিয়ে লোকগুলো পালিয়ে গেছে, তার কাছেই উত্তরসাধকের শূন্য আসন। গোবিন্দ সেদিন এইখানেই বসেছিল। ওধারে কারণবাবার নিঃসাড় দেহটা উপুড় হয়ে আছে। ঘাড়ের উপর ছোরার আঘাত। রক্তের ধারা নেমেছিল দুধার দিয়ে। এখন শুকিয়ে জমে আছে। পাশের ছোরাটিও আমি দেখতে পেলুম। চম্‌কে উঠলুম এই ঝকঝকে ছোরাখানা দেখে।

বিহ্বলভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর সোহন বলল: আমাদের নিয়ে পুলিসে না টানাটানি করে।

কেন?

সোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সারারাত ছোকরা বাইরে ছিল।

আমি জানি, এ ছোরা সেই ছোকরার নয়। আমাদের ক্যাম্পেরই নয়। এ ছোরা আমি অন্যত্র দেখেছি। কিন্তু সে কথা কি বলা চলে।

সমাপ্ত